শ্রমিক

ঊনবিংশ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা | জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৬

১. কৃষি শ্রমিকের কথা

২. শোভন কাজ যেন সোনার হরিণ

৩. শিল্পের অধিকারকেন্দ্রিক কাঠামোগত পরিবর্তন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধারণা এবং নীতি নির্ধারন প্রসঙ্গে প্রস্তাবনা-বিষয় রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকল

৪. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক ও তাঁদের অবস্থান

৫. কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (সি এস আর): সামাজিক ন্যায় বিচার ও শ্রমিকের কল্যাণ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

শ্রমিক

ঊনবিংশ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা | জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৬

www.bilsbd.org

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

শ্রমিক

ঊনবিংশ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা | জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৬

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পরিষদ

মেসবাহউদ্দীন আহমেদ

মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা

অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম

রায় রমেশ চন্দ্র

প্রধান সম্পাদক

নজরুল ইসলাম খান

সম্পাদক

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ

সহযোগী সম্পাদক

মোঃ ইউসুফ আল-মামুন

সহকারী সম্পাদক

ফারিবা তাবাসসুম

মুদ্রণ

সারকো মিডিয়া এইড সার্ভিসেস

৮৫/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়িঃ ২০, সড়ক ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

ফোনঃ ৮৮০-২-৯০২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১৪৩২৩৬, ৯১১৬৫৫৩

ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৫৮১৫২৮১০ ই-মেইলঃ mail: bils@citech.net

ওয়েবঃ www.bilsbd.org

শ্রমিক

ঊনবিংশ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা | জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৬

সূচিপত্র

১. কৃষি শ্রমিকের কথা ৭

২. শোভন কাজ যেন সোনার হরিণ ১০

৩. শিল্পের অধিকারকেন্দ্রিক কাঠামোগত পরিবর্তন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধারণা এবং নীতি নির্ধারন প্রসঙ্গে প্রস্তাবনা -বিষয় রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকল ১৭

৪. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক ও তাঁদের অবস্থান ২৬

৫. কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (সি এস আর) : সামাজিক ন্যায় বিচার ও শ্রমিকের কল্যাণ ৩৭

সম্পাদকীয়

বিল্‌স এর বাংলা গবেষণা জার্নাল "শ্রমিক" এর বর্তমান সংখ্যায় বাংলাদেশে কৃষি শ্রমিকের বর্তমান অবস্থা, শোভন কাজ পরিস্থিতি, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পাটশিল্প খাতে কাঠামোগত পরিবর্তন ও শ্রমিকের ওপর এর প্রভাব, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক ও তাঁদের অবস্থান এবং ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা বা (সি এস আর) নিয়ে মোট পাঁচটি লেখা প্রকাশিত হলো। সমসাময়িক এই লেখাগুলোয় বিভিন্ন খাতের শ্রম পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে লেখকরা তাদের মতামত তুলে ধরেছেন।

বিভিন্ন পরিস্থিতির কারনে বাংলাদেশের কৃষিখাতের শ্রমিকের অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের ফলে শ্রমসংকটে পড়ছে এই খাত। দেশের অর্থনীতি যেহেতু এখনও বহুলাংশে কৃষিনির্ভর, তাই এ ধরনের সংকট অদূর ভবিষ্যতে দুর্ভোগ আরও বৃদ্ধি করতে পারে। এ বিষয়ে এখনই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

'সোনালী আঁশ' খ্যাত পাটের ওপর নির্ভরশীল দেশের পাটশিল্পে সংকট ও বন্ধ্যাত্বের পেছনে নানামুখী কারন রয়েছে। এ সমস্ত কারণে এই শিল্পে কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছে। একসময় 'সূর্যাস্ত শিল্প' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে এগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হলেও পরবর্তীতে আবার খুলে দেয়া হয়। এই পতন-উত্থান শ্রমিকের জীবনমানে এনেছে নানামুখী দুর্যোগ, প্রতিবন্ধকতা ও পরিবর্তন। আমরা আশা করি পাটশিল্পের পূণরুজ্জীবনে যেন আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে এই খাতের অর্থনীতি, সেই সাথে শ্রমিকের জীবন মানেও যেন আসে ইতিবাচক পরিবর্তন।

শোভন কাজ সৃষ্টির উপর সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হলেও বাংলাদেশে সেই অর্থে এটির সফল বাস্তবায়ন হয়নি। তবে বর্তমানে ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে, উন্নয়ন টেকসই করতে হলে সবার জন্যই তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই অর্থে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য শোভন কাজ সৃষ্টি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি বাস্তবায়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল মহলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এখনও আমাদের বহুদূর যেতে হবে। অধিকার, মজুরি, জীবনমান, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কম-বেশী বঞ্চনার মধ্যে রয়েছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা। অথচ দেশের শ্রমখাতের সবচেয়ে বড় অংশ এটি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টি ও সংগঠিত হওয়ার পেছনে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভূমিকা রয়েছে। তবে একে আরও সামনে এগিয়ে নিতে হলে ট্রেড ইউনিয়ন, মালিকপক্ষ, সরকার ও নাগরিক সমাজকে জোরালোভাবে একত্রে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে।

ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা বা (সি এস আর) কর্মকান্ডটি কর্পোরেট ক্ষেত্রে বর্তমানে বেশ পরিচিত এবং এ বিষয়ে নানামুখী উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। তবে এটিকে শ্রমিকের কল্যাণে আনতে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণী দিক নির্দেশনা। আশা করা যায় আমরা হয়তো খুব শিগগিরই সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সচেষ্ট হবো।

বর্তমান সংখ্যায় স্বল্পায়তন বিশ্লেষণধর্মী এই লেখাগুলো তথ্যবহুলও বটে। আশা করা যায় লেখাগুলো পাঠক ও গবেষকদের কাজে লাগবে।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ
সম্পাদক

কৃষি শ্রমিকের কথা

ড. মাহফুজুল হক [১]

আমার দেশের বাড়ী উত্তরবঙ্গের নিভৃত এক পল্লীতে। পাশেই প্রবাহমান ব্রহ্মপুত্র নদ। প্লাবন বাহিত, খুব উর্বর জমি, ধান ফলালেই সোনা। তবে বর্ধিষ্ণু গ্রামের চিত্র এখন ক্রমাগতঃ বদলে যাচ্ছে। লাঙ্গল, কাঁধে নিয়ে এখন আর কৃষককে গরু নিয়ে মাঠে যেতে হয় না। তার বদলে এসেছে যন্ত্রচালিত ট্রাক্টর মেশিন। গোবর-আবর্জনা ছাই দিয়ে যে পাঁউশ তৈরি করে জমিতে ফেলা হত, তার পরিবর্তে এসেছে ইউরিয়া, রাসায়নিক সার। পোকা-মাকড় দমনে যে ছাই, গো-চানা ব্যবহার করা হত তার পরিবর্তে এসেছে বোতল ভর্তি মারাত্মক বিষ। কিষাণীর মটকায় এখন আর ধান বীজ তাকে না। প্রতিবার কিনতে হয় চড়া দামে বীজভান্ডার থেকে। বিভিন্ন প্রজাতির সুমিষ্ট ধানের পরিবর্তে এসেছে বানিজ্যিক প্রজাতির হাইব্রিড, বি-আর ২৮, বি-আর ২৯, ইত্যাদি। এত কিছুর পরও যে ধান উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্য চরম হতাশাজনক। কৃষকের মাথায় হাত। সে ধানী জমিতে আর লাভ দেখছে না। তাই শুরু হয়েছে কৃষি শ্রমিক মাইগ্রেশন। ধানের ক্ষেত হতে শ্রমিক ছুটছে অন্য খাতে পরিবহন, গৃহ নির্মাণ , ইটের ভাটায়।

কৃষি শ্রমিকের আকাল:

আজকাল ধানের বীজ রোপন, পরিচর্যা এবং কাটার সময় কৃষি শ্রমিক পাওয়া দুস্কর হয়ে পড়ে। করজোড় অনুরোধ করেও শ্রমিক পাওয়া যায় না। কেউ গৃহ নির্মাণ শ্রমিক, রিকশাচালক হয়ে ঢাকায় চলে যায় মৌসুমী কাজের সন্ধানে। কেউ ভ্যান, রিক্স, ভটভটি চালায়। আবার অনেকেই দেশে থেকে সরকারি স্লিপ নিয়ে কাজের বিনিময়ে খাদ্য , মাটি কাটার কাজ ইত্যাদিতে ঢুকে যায়। ফলে দেশে এখন চলছে কৃষি শ্রমিকের দারুন সংকট। আগের মত দই মিষ্টি সহযোগে "বামুন কৃষান" আজ আর নেই। এখন বিঘাপ্রতি দুই হাজার টাকা চুক্তিতে ধান কাটা হয়। তাও সময় মত শ্রমিক পাওয়া যায় না। ধান লাগানোর সময়ও একই অবস্থা।

অলাভজনক ধান চাষ:

আমার যেহেতু পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া কিছু জমি আছে তা দেখতে প্রায়শই বাড়ীতে যেতে হয়। আধিয়ারদের চোখ-মুখ অন্ধকার। জমি চাষ লাভজনক হচ্ছে না। ধানের এত কম মূল্য থাকলে জমি আবাদ করে কী লাভ? হিসেব করে দেখলাম এক বিঘা নিজের জমিতে ধান চাষ বাবদ খরচ হয় ৯৭০০ টাকা। এ খরচের মধ্যে আছে জমি প্রস্তুত করা, লাঙ্গল চাষ, পানি সেচ, চারা উত্তোলন, সার প্রয়োগ (দুইবার) চারা রোপন, নিড়ানী, অষুধ প্রয়োগ, ধান কাটা, মাড়াই ও উড়ানী বাবদ সকল ব্যয়। আর জমিটা লীজ নেওয়া হলে মোট খরচ আসে ১২,২৭০ টাকা। এক বিঘা জমিতে মোটামুটি ২০ মন ধান হয়। ধান কাটার মৌসুমে দাম থাকে সর্বনিম্নে। ধার দেনা শোধ করতে কৃষককে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হতে হয়। ঐ সময়

---

১ প্রাক্তন সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার

ধানের দাম থাকে মন প্রতি ৫০০ টাকা (বি-আর ২৮), ৪৫০ (বি-আর ২৯) এবং ৩৮০ টাকা (মোটা হাইব্রিড)। সে মতে হিসেব করলে প্রতি বিঘায় কৃষকের ক্ষতি হয় দুই থেকে চার হাজার টাকা।

ধানের বিকল্প ফসলঃ

সত্যিই তো ধান চাষ করে কোন মূল্য না পা্ওয়া গেলে কেনইবা এই পন্ডশ্রম। জিজ্ঞেস করলাম অন্যান্য ফসলের আবাদ করা যায় না? যেমন পেঁয়াজ, মরিচ, শশা, পটল, ঝিঙ্গা, শিম ইত্যাদি শাক সব্জি। এসব ও তো অর্থকরী ফসল। সবারই সমস্বরে একই উত্তর কিন্তু পাহারা দিবে কে? একসঙ্গে ২০/২৫ বিঘা জমিতে একটি 'গ্রোয়ারস্ সমিতি' করলে এমন চাষাবাদ করা যায়। তবে এজন্য প্রয়োজন পুঁজি. সাহস, প্রশিক্ষণ এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা। উত্তরবঙ্গের বগুড়া-শেরপুর এলাকায় বেশ কয়েকটা জায়গায় দেখেছি কৃষকরা সব্জির চাষ করে লাভবান হয়েছে। জমির পটল, শিম, ঝিঙ্গা, বরবটি, লাউ কেনার জন্য ঢাকা থেকে ট্রাক সরাসরি কৃষকের জমিতে যাচ্ছে। ধানের কম মূল্য তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। রাজশাহী যাওয়ার পথে চলনবিলের দু'পাশে মাঠের পর মাঠ রসুনের আবাদ দেখেছি। এমনকি যশোর, সাভার অঞ্চলের ফুল চাষ এখন লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। মাঠের পর মাঠ গোলাপ, রজনীগন্ধা, জারবেরা, গ্লাডিওলাস, গাঁদা, থরে থরে সাজানো। কৃষকেরা ঝুঁকি নিতে ভয় পায় মার খাওয়ার ভয়ে। তাই প্রতিবারই তারা ধান চাষ করে এবং কম বিক্রয় মূল্যের কারনে মার খায়। মার খাওয়ার পর পূনরায় ধান চাষ করে। ফলে অলাভজনক ধান আর কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকদের আকৃষ্ট করতে পারে না। কৃষকের সন্তানেরা এখন আর কৃষি খাতে আসতে চায় না। লাভজনক মোটর লাগানো রিক্ষ্যান, নসিমন, করিমন ভটভটি চালায়। ইউনিয়ন পরিষদে মাটি কাটে, চেয়ারম্যান-মেম্বারদের ঘুষ দিয়ে কাজ জোগাড় করে এবং একপ্রকার কাজ না করেই টিপসই দিয়ে টাকা তোলে।

নারী শ্রমিকঃ

নারী শ্রমিকরা এতদিন যারা ধান নিড়ানী , আগাছা পরিষ্কার, ধান সিদ্ধ, শুকানো, ঝাড়া ইত্যাদির কাজ করত তাদেরকে এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। সারা বছরের জন্য তারা কাবিখা, কাবিটা, দূ:স্থ ভাতার কার্ড নিয়ে মাটি কাটার কাজে নাম লিখিয়েছে। সবাই টিফিন হাতে, দল বেঁধে, মোবাইল কোমরে গুঁজে যাচ্ছে মাটি কাটা নামক ফাঁকি দেয়ার কাজে। শ্রমের মজুরী কৃত্রিম ভাবে বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত। ফলে কৃষির ভরা মৌসুমে এ ধরনের লাভজনক কাজে নারী শ্রমিকরা ঝুঁকে পড়ছে। জরিমন করিমনদের আর কৃষি জমিতে ডাকলেও পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে জমির মালিক, আধিয়ারের মাথায় হাত। জমিতে ধান পেকে শুকিয়ে যাচ্ছে, কাটার লোক নেই। কাটলেও সিদ্ধ, শুকানোর লোক নেই। ধান মেশিনে ভাঙ্গার পর ঝাড়া, বস্তাবন্দি করার লোক নেই। পুকুরে জেলে দিয়ে মাছ ধরার পর, মাছ কাটা, ধোয়া, রান্না করার লোক নেই। গ্রামের গৃহকর্মীরা ত অনেক বছর আগে থেকেই উধাও হয়ে গেছে।

তামাকের আগ্রাসন:

ধানের কম মূল্যের পাশাপাশি আরো একটি আতঙ্ক যুক্ত হয়েছে। তা হল দেশের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় তামাকের আগ্রাসন। কুষ্টিয়া, নীলফামারী, বান্দরবান, রংপুর, মানিকগঞ্জ এর নদী পাড়ের উর্বরা জমিগুলোতে চলছে অবাধে তামাক চাষ। আগে যেখানে ধান ক্ষেতে বাতাস দোল খেত সেখানে এখন পর্বত সমান আগ্রাসী তামাক পাতা গম্ভীরভাবে দাড়িয়ে আছে। ৮ মাসের এই ফসল জমির সব উর্বরা শক্তি টেনে নিচ্ছে। শ্রমিকের ত্বকে ঘা, ফুসফুসে ঘা, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট। তামাক পোড়ার ঘরে তরতাজা শ্রমিক নির্জীব শুয়ে আছে নিকোটিনের ভয়াবহ প্রভাবে। এলাকায় হাঁস-মুরগীর চাষ বন্ধ। জমিতে বিষ দেয়া হয়েছে। জিজ্ঞেস করছিলাম ক্ষতিকর তামাক চাষ কেন করেন? তামাক চাষীর উত্তর অগ্রীম পূজি ও নগদ লাভ। পরিবেশের ক্ষতি হয় না? সে তো সরকারের ব্যাপার, কৃষকের নির্বিকার উত্তর।

কৃষিখাত ভর্তূকী:

একসময় কৃষি খাতে ভর্তুকী দেওয়া হত। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-দের অত্যাচারে তা এখন শূণ্যের কোঠায়। অথচ জাপানী কৃষক এখনও ৬০%, আমেরিকার কৃষক ৪৫%, ইউরোপের কৃষক ৪০% ভর্তুকী পেয়ে থাকে। সেখানে ২০১৫-২০১৬ সনের বাজেটে কৃষি ভর্তুকীর পরিমান রাখা হয়েছে মাত্র ৯, ০০০ কোটি টাকা এবং বাজারে যার কোন প্রতিফলন দেখো যায় না। কৃষি খাতে "টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা" অর্জনের জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। স্বাধীনতার সময় সাড়ে সাত কোটি মানুষ এখন বেড়ে দাড়িয়েছে ১৬ কোটিতে। ১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য এখন বায়োটেকনোলজির কারনে ৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন হয়েছে। গত ৪৫ বছরে মানুষ বেড়েছে দ্বিগুণ। কিন্তু তার সাথে পাল্লা দিয়ে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বেড়েছে তিন গুণ। তবুও কৃষকের হাহাকার যাচ্ছে না। সরকার নির্ধারিত ধানের মূল্য কৃষক পাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে ধান ক্ষেত ছেড়ে কৃষি শ্রমিকেরা দলে দলে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। এখন তারা নির্মাণ শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, ইট ভাটা শ্রমিক, মাটি কাটা শ্রমিক। বিরান হয়ে পড়ছে ধানী জমি। সামনে হয়ত এমন দিন আসছে যখন জমিতে ধানের পরিবর্তে শোভা পাবে দিগন্তজোড়া ফুল আর দৈত্যাকৃতির তামাক পাতা।

শোভন কাজ যেন সোনার হরিণ

মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা [১]

১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ টঙ্গীর বিসিক শিল্প এলাকায় অবস্থিত টাম্পাকো ফয়েল কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে ৪০ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং ৭০ এর উপরে শ্রমিকের আহত ও ১০ জন শ্রমিকের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় এটা খুবই স্পষ্ট হয়েছে যে সরকারের পরিদর্শন বিভাগ শ্রমিকের নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং বহুজাতিক কোম্পানী সমূহ যে সব ফ্যাক্টরীর মাধ্যমে ব্যবসা করে সে সব ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও নিরাপদ কর্মস্থলের ব্যাপারে খুবই উদাসীন। উল্লেখ্য টাম্পাকো নেসলে এবং আমেরিকান টোবাকোর কাজ করতো। বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর আন্তর্জাতিক চেইনের সবর্ত্র শ্রমিক অধিকার নিষ্ঠুরতার সাথে দমন করা হয়।

টাম্পাকোর মালিকরা তাদের মুনাফার কারন ছাড়া কখনও কর্মস্থলের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায়ই নেয় নি। দেখা গেছে ফয়েল কারখানাটিতে প্রবেশ এবং বের হবার জন্য একটি মাত্র প্রবেশ পথ ছিল। প্রচুর পরিমানে দাহ্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি মজুত ছিল। পুরাতন ভবনটি কোন ভাবেই কারখানার জন্য উপযুক্ত ছিল না। তাছাড়া আগুন নির্বাপনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শ্রম আইন ও শ্রম বিধির কোন ধারাকেই গ্রাহ্য করা হয় নাই। সিঁড়িবিহীন এ কারখানাটি ছিল একটি মৃত্যুকূপ। এই অব্যবস্থাপনা থেকে এটাই প্রমানিত হয় যে সরকার, মালিক ও বহুজাতিক কোম্পানীগুলো শ্রমিকদের জীবন রক্ষার জন্য সব সময়ই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিল।

শ্রমিকদের মর্যাদা, ইউনিয়ন গঠন ও দরকষাকষির মৌলিক অধিকার , নিরাপদ কর্মস্থল, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সহ সকল মৌলিক অধিকারসমূহকে ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্গন করার ফলেই এই জঘন্য হত্যাকান্ডটি সংঘঠিত হয়। এত বড় পাপ ও অন্যায় ক্ষমা করে দেবার যে রীতি চালু আছে তার ফলেই মালিক ও বহুজাতিক কোম্পানীরা শ্রমিকদের মৃত্যূমুখে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা রানা প্লাজা, তাজরীন ফ্যাশন এবং টাম্পাকোর মত ঘটনার এখানেই শেষ দেখতে চাই। যদি এই কারখানায় ইউনিয়ন থাকত, সেইফটি কমিটি থাকত তবে অবশ্যই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটত না।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা শোভন কাজ সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। কিন্তু শোভন কাজের ব্যাপারে যথেষ্ট সময় দিতে পারে নাই। ২০১৫ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে সকল সদস্য রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা টেকসই উন্নয়ণ লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছেন। এতে বলা হয়েছে, কাউকে পেছনে ফেলে নয়, উন্নয়ণ টেকসই করতে হলে সবার জন্য উন্নয়ণ করতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য শোভন কাজ সৃষ্টি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শোভন কাজ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অসম্ভব। **শোভন কাজ বলতে কি বোঝায়?** আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতে খুব সহজ ভাষায় শোভন কাজ বলতে সে

[১] সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন

কাজকেই বোঝায় যা উৎপাদনক্ষম, ভালো মজুরী নিশ্চিত করে, নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত কর্মস্থল, সামাজিক নিরাপত্তা সহ শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য তাদের সংগঠন করার এবং যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার নিশ্চিত করে। মহিলা ও পুরুষ সবাই সমান সুযোগ সুবিদা পাবে। শ্রমিকরা শ্রমের মর্যাদা ভোগ করবে। শোভন কাজের চারটি মূলস্তম্ভ হলঃ পূর্ণ ও উৎপাদনক্ষম কাজ, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সংলাপ।

টেকসই উন্নয়নের ৮ নং লক্ষ্যমাত্রায় টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পূর্ণ এবং উৎপাদনক্ষম চাকুরী সৃষ্টি এবং সবার জন্য শোভন কাজ নিশ্চিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের শুধু ৮ নম্বর ধারায় নয় অন্যান্য অনেক স্থানে সবার জন্য শোভন কাজ, সবুজ কাজ সৃষ্টির কথা গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ণ লক্ষ্যমাত্রায় বিশ্বব্যাপী অশোভন কাজের বিস্তারের বিপদের কথা ও উচ্চারিত হয়েছে এবং সকল সরকারকে সর্বত্র শোভন কাজ সৃষ্টির জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। শোভন কাজ, টেকসই উন্নয়ণ লক্ষ্যমাত্রার মাঝখানেই রয়েছে। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে সরকার, বহুজাতিক কোম্পানী এবং দেশীয় কোম্পানীদের সদিচ্ছার উপর, নাহলে তা ব্যর্থ পরিহাস বলেই গণ্য হবে।

সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী দুইটি অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক মহামন্দায় এক বিলিয়ন লোক চাকুরীচ্যুত হয়েছে। তাই চাকুরী সৃষ্টি করা সরকারের জন্য অবশ্য কর্তব্য হিসেবে সামনে এসেছে। দারিদ্র্য হ্রাসে বেকারদের জন্য কাজ সৃষ্টির বিকল্প কিছুই নেই। তবে সে সব চাকুরী হতে হবে শোভন কাজ । সে কাজ হতে হবে উৎপাদনক্ষম এবং ভালো মজুরী সম্পন্ন। শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের শ্রম বিক্রয় করে তাদের পরিবারের মূখে অন্ন যোগাতে, সন্তানদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে, অসুস্থতার সময় চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আর থাকার জন্য একটি বাসস্থানের কারণে। একজন শ্রমিকের খুবই কম চাহিদা। অর্থনৈতিক দূর্দশার এই সময়ে কাজ সৃষ্টি করা প্রতিটি সরকারের কাছেই অতি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা। আমরা যদি বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমান কাজের সৃষ্টি করতে পারতাম তাহলে নিরুপায় লোকজন সর্বস্ব বিক্রি করে দালালদের খপ্পরে পড়ে পাচার হয়ে যেত না। হাজার হাজার নারী পুরুষ এবং শিশু শত বিপদ মাথায় নিয়ে সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে ডুবে মারা যেত না। কিছুই হতনা যদি সরকার প্রয়োজনীয় শোভন কাজ সৃষ্টি করতে পারতো।

এটা সত্য, প্রচন্ড দারিদ্র্যের কারনে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী তাদের পরিবারের সহায়তার লক্ষে, একটু সুদিনের মুখ দেখার জন্য দেশের মায়া ত্যাগ করে অভিবাসী শ্রমিক হয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। অভিবাসী শ্রমিকদের দুঃখ দূর্দশা বর্ণণাতীত। নারকীয় পরিবেশে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ১০ থেকে ১২ জন শ্রমিক একটি ছোট কামরায় বসবাস করে। মজুরি খুবই কম। সম্প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত জোরালোভাবে অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পোপ ফ্রান্সিস তাদের শ্রম দাসের সাথে তুলনা করেছেন। শোভন কাজ অভিবাসী শ্রমিকদের কাছে স্বপ্ন। কিন্তু চাকরি তো করতে হবে? চাকরিই

মানুষকে সমাজের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে। নিরাপদ, উৎপাদনক্ষম এবং ভালো বেতন সম্পন্ন একটি স্থায়ী কাজ মানুষকে তার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে। নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপিত হয়। সমাজ সংসারে তার প্রয়োজনীয়তা সে উপলব্ধি করতে পারে।

একজন বেকারই বুঝতে পারে বেকারত্বের জ্বালা। সেজন্যই ট্রেড ইউনিয়ন এই অসম সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়। সর্বক্ষেত্রে অসমতা বেড়ে চলেছে। অসমতা টেকসই উন্নয়নের জন্য সবচাইতে বড় হুমকি হয়ে উঠেছে। একথা সবাই স্বীকার করেন যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি সত্ত্বেও অসমতা বেড়েই চলেছে। আয়ের এই বিরাট বৈষম্য, অসমতা, খুবই উৎকটভাবে মানুষের চলাফেরা, পোষাক পরিচ্ছেদ, খাবার দাবার, বাসস্থান ও জীবন ধারার প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান। যা কষ্টদায়ক এবং এটা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিশ্বের এক বিলিয়ন লোকের প্রতিদিনের আয় দুই মার্কিন ডলারের নিচে। ১.৩ বিলিয়ন মানুষের প্রতিদিনের আয় এক মার্কিন ডলারের নিচে। ১.২ বিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। বাংলাদেশে যে সব এনজিও গরীব মানুষের মাঝে কাজ করে তারা ও হতদরিদ্র পঞ্চাশ লক্ষ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছাতে পারে নাই। অতি সম্প্রতি আইএলওর গভর্নিং বডির অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রমিক প্রতিনিধিরা বিশ্বব্যাপী চাকরি সৃষ্টির অত্যন্ত শ্লথ গতি, মজুরী বৃদ্ধি না করা এবং দ্রুত গতিতে দারিদ্র্যের বিস্তারে অত্যন্ত ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেন যে এর ফলে দ্রুত গতিতে আয়ের বৈষম্য ও আর্থিক অসমতা বেড়ে চলেছে যা সারা বিশ্বকে বিপদের সম্মুখীন করেছে।

বর্তমান বিশ্ব অর্থনেতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত এবং বানিজ্য নীতি বিশ্বের ছয় শত কোটি মানুষের জন্য কাজ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। শোভন কাজ, ভালো বেতন, নিরাপদ কর্মস্থলের পরিবর্তে বিশ্ব সরবরাহ চেইন সহ সর্বত্র আধুনিক দাস প্রথা চালু করেছে।

শুধুমাত্র অভিবাসী মহিলা গৃহশ্রমিকদের কথাই ধরা যাক। লক্ষ লক্ষ মহিলা শ্রমিকদের উপর অকথ্য নির্যাতন ও তাদের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার কথা জানতে পেরে জাম্বিয়ার অভিনেত্রী ও গায়িকা লিন্ডওই বুনগেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার আধুনিক দাস প্রথার বিরুদ্ধে আইএলও প্রচারনা ৫০ এর প্রতি সমর্থন জানান। আইএলও প্রচারনা ৫০ এর উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে বিশ্বব্যাপী আধুনিক দাস প্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে সরকার সমূহ জোর জবরদস্তিমূলক শ্রম রহিত করার আন্তর্জাতিক চুক্তি, জোর জবরদস্তি মূলক শ্রম প্রটোকল অনুসমর্থন করেন। দাস প্রথা অবশ্যই চিরতরে নির্মূল হতে হবে।

কেন এই আধুনিক শ্রম প্রথা সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে? কারণ মানব ইতিহাসের মধ্যে বর্তমানে মালিক গোষ্ঠী সবচাইতে ক্ষমতাশালী। মালিকদের এত ক্ষমতা, এত আধিপত্য আর কোন কালে ছিল না। ক্ষমতাবান এবং সম্পদশালী মানুষ সবসময় নির্দয় ও নিষ্ঠুর হয়। ধনদৌলত, মুনাফা ও লোভের কোন শেষ নেই। এসব লোকেরা কোন কিছুকে অথবা কাউকে কোন পরোয়া করে না। তারা শুধু নিজেদের কথাই চিন্তা করে।

মুক্তবাজার অর্থনীতি, বানিজ্য উদারীকরণ, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সম্পর্কিত বা আর্থিক সংগঠনসমূহ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সমূহের প্রেসক্রিপশন এই গ্রহটাকে গরীব মানুষের জন্য নরকে পরিনত করেছে। কোন দেশকে ঋণ দেয়ার শর্তে সে দেশের সরকারকে প্রয়োজনীয় জনহিতকর খাত থেকে ভর্তূকি প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে। জনহিতকর এইসব খাতগুলো হলোঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, যাতায়াত, কৃষি ইত্যাদি। এই সমস্ত জনহিতকর সরকারী সেবা থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এসব সেবাখাতকে ব্যক্তি মালিকানায় নিয়ে আসা হয়েছে। কল্পনা করুন ঢাকার একটি প্রাইভেট হাসপাতাল বা ক্লিনিকের চিকিৎসা খরচ এবং সরকারী কোন হাসপাতালের মধ্যে খরচের পার্থক্য? এসবের প্রভাব পড়ে দরিদ্র জনগণের উপর। যার ফলে তারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যে কোন নোংরা ও ক্ষতিকর কাজে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। কেননা পরিবার পরিজনের মূখে দুমুঠো অন্ন দিতে হবে।

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পকে পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে ভয়ংকর কাজ বলে গন্য করা হয়। সীতাকুন্ড সহ জাহাজ ভাঙ্গা ইয়ার্ডগুলোতে ২০১৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ১৫ জন শ্রমিক দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। প্রতি বছরই ১০ থেকে ১৫ জন শ্রমিক নিহত হয়। কত ভয়ংকর কর্মপরিবেশ তা না দেখলে অনুমানও করা যাবে না। উত্তর বঙ্গের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার অসহায় লোকজনই মূলত এসব জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে কাজ করতে আসে।

কৃষিতে বহুল পরিমানে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে। অত্যন্ত ক্ষতিকর বিষাক্ত পোকা মারার ঔষধ, নিন্মমানের সার সহ বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার কৃষি খাতকে অনিরাপদ, অস্বাস্থ্যকর করে ফেলেছে। বিভিন্ন নতুন নতুন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে কৃষক ও কৃষি শ্রমিকরা।

অসংগঠিত খাতের ৮০ ভাগ শ্রমিকের কর্মস্থলই অনিরাপদ, অস্বাস্থ্যকর। নির্মাণ শ্রমিকদের উচু থেকে পড়ে মৃত্যুর খবর প্রায়ই খবরের কাগজে ছাপা হয়। উপরোল্লেখিত প্রতিটি খাতেই শোভন কাজ অনুপস্থিত।

এখনও লক্ষ লক্ষ শিশু শ্রমিক অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছে। এসব শিশু শ্রমিক অত্যন্ত স্বল্প মজুরিতে ১০/১২ ঘন্টা কাজ করতে বাধ্য হয়। তারা ইউনিয়ন করার কথা বলে না। কোন অধিকারের কথা বলে না। অসহায় এসব শিশু শ্রমিক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রতিদিন দীর্ঘসময় কাজ করে শুধুমাত্র দুঃস্থ পরিবারকে একটু সহায়তা করার জন্য। শোভন কাজ তো তাদের স্বপ্নেও ধরা দেয় না।

শোভন কাজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ হলো শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করন। ২০০৬ সালের শ্রম আইন যা ২০১৩ সালে সংশোধিত হয় তাতে শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন ও যোগদানে প্রচুর ঘাটতি রয়েছে। ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। কোন কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করতে হলে শতকরা ৩০ ভাগ শ্রমিকের বাধ্যতামূলক ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার বিধান এবং সার্বক্ষণিক ট্রেড

ইউনিয়ন কর্মীদের কারখানার শ্রমিক না হওয়ায় কারখানা পর্যায়ের ইউনিয়নে নেতা নির্বাচনের অযোগ্য করার কালো আইন সমগ্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতি চরম আঘাত হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়ার শাসনামলে ট্রেড ইউনিয়ন শূন্য বাংলাদেশ গঠন করার প্রাথমিক এই কাজটি করা হয়। এর পরবর্তী কোন সরকারই শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী এই কালো আইনকে স্পর্শ করেন নাই । আইএলও কনভেনশন ৮৭ মোতাবেক শ্রমিকরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাউকে নেতা নির্বাচন করার অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। পাকিস্তান আমলে এবং বঙ্গবন্ধুর শাসনামল পর্যন্ত কারখানার শ্রমিক না হয়েও সার্বক্ষণিক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা বেসিক ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নেতা নির্বাচিত হতে পারতেন। ট্রেড ইউনিয়নের সব বরেণ্য নেতারা কেউ কারখানার শ্রমিক ছিলেন না। ইপিজেড এলাকার শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমি এটা স্বীকার করি স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কর্ম পরিবেশ, কারখানা নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছু উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু এসব উন্নয়ন সম্পূর্নই ব্যার্থ হয়েছে যেহেতু কারখানা ও প্রতিষ্ঠান সমূহে কোন ইউনিয়ন নেই। রানা প্লাজা, তাজরীন ফ্যাশন এবং টাম্পাকো কোথাও ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। একমাত্র ট্রেড ইউনিয়নই নিরাপদ কর্মস্থল, বেতন বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা কমিটি গঠন সহ সকল শ্রম অধিকার রক্ষা করতে পারে।

দূর্ভাগ্যবশত মালিকরা ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। তাদের কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার কোন উদ্যোগের খবর পাওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে তাৎক্ষণিক ভাবে বরখাস্ত করা হয়। শ্রমিকদের শোষন করে সর্বোচ্চ মুনাফা করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

ট্রেড ইউনিয়ন করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সব সরকারই চরমভাবে ব্যার্থ হয়েছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন শতকরা ৯৯ ভাগ কলকারখানায় কোন ইউনিয়ন নাই। রানা প্লাজা ট্রাজেডির পর বিভিন্ন বিদেশী ক্রেতা ব্র্যান্ডসহ অধিকার বিষয়ক ও আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের প্রবল চাপের মুখে গার্মেন্টস কারখানাতে শ্রমিক ইউনিয়ন করার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরও কৌশলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে বাধা দেয়া হয় যার ফলে শতকরা একভাগ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতেও ইউনিয়ন গঠন করা সম্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রায়াত্ত খাতের কলকারখানা সমূহে ট্রেড ইউনিয়ন আছে। তা্ও ধীরে ধীরে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার ফলে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। ১৯৯০ এর দশকে যেখানে ৩.৭ শতাংশ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য ছিল এখন তা কমে ১ শতাংশের নীচে চলে এসেছে।

আইএলও'র একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সফরে আসেন। বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতিতে তারা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে ইপিজেড এলাকার শ্রমিকদের ইউনিয়ন না করতে দেয়ার ব্যাপারে শক্ত মন্তব্য করেন।

সামাজিক নিরাপত্তা শোভন কাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। বিশ্বের ৯০ ভাগ শ্রমিকই সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের

ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতে শ্রমিকদের জন্য কোনরূপ পেনশন নেই। ইনসিওরেন্সের আওতায় থাকা শ্রমিকদের সংখ্যা খুবই স্বল্প।

সামাজিক সংলাপ শোভন কাজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। যত অসন্তোষই থাকুক না কেন দ্বি-পাক্ষিক ও ত্রি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি সম্ভব। কিন্তু মালিক পক্ষ ও সরকার উভয়েই সংলাপের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। কারখানা স্তরে মালিকরা ইউনিয়নের সাথে সংলাপে বসতে চায় না। অনেক মালিক ইউনিয়নকে স্বীকৃতিই দিতে চায় না। শ্রম মন্ত্রনাল ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ত্রি-পক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের সভা ডাকা হয় না। বাংলাদেশে মালিক শ্রমিক সম্পর্ক ভালো নয়। কিন্তু টি সি সি শ্রমিক মালিক ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে যথেষ্ট কাজ করতে পারে। কিন্তু টি সি সি'কে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। এ অবস্থায় শোভন কাজ কি করে সম্ভব?

আধুনিক দাস প্রথা বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনের সর্বত্র দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক, দেশীয় ও স্থানীয়ভাবে এর দ্রুত বিস্তার পরিলক্ষিত হচ্ছে। বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনের বর্তমান মডেলটি সর্বত্র শোভন কাজকে অগ্রাহ্য করেছে, শোষণ ও অসমতাকে দ্বিগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে আইএলও'র গভর্নিং বোর্ডের সভা জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় শোভন কাজ এবং ইনক্লুসিভ টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যেসব চ্যালেঞ্জ সমূহ রয়েছে তা দূরীভূত করার জন্য একটি বৈশ্বিক নীতিমালা গ্রহণের জন্য আলোচনা করে। আইএলও'র গভর্নিং বডি সিদ্ধান্ত নেয় যে আইএলও তার সহযোগী সকল পক্ষ সরকার, মালিক ও শ্রমিক সবাই বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে শ্রমিকদের অধিকার ভঙ্গ করার বিষয়টি মোকাবেলা করবেন। গভর্নিং বডি সকল সরকারকে সর্বত্র বিশেষ করে বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনের সর্বত্র কাজের পরিবেশ বিশেষ করে বেতন, কাজের সময়, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত রাখার জন্য আহ্বান জানান। কোনভাবেই নীচুমানের কাজ সৃষ্টি করে শ্রমিকদের অধিকার ও শোভন কাজ ক্ষুন্ন করা থেকে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে বিরত রাখার জন্য সরকার সমূহকে আহ্বান জানান। কিন্তু এটাও সত্য সরকার বহুজাতিক কোম্পানী সমূহকে তাদের দেশের মধ্যে বা দেশের বাইরে তাদের খারাপ ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনের বর্তমান এই মডেল যা বিশ্ব অর্থনীতিতে একক প্রাধান্য বিস্তার করে আছে শোষণ ও অসমতার মাধ্যমে, সরকার যাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না নিজ দেশে অথবা বিদেশে, তার অর্থ হলো :

- কোটি কোটি শ্রমিক দাস হয়ে পৃথিবীর বিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলোর জন্য পণ্য উৎপাদন করবে।
- বৈশ্বিক সরবরাহ চেইন, যা বিশ্বের অসম ব্যবসার জন্য দায়ী তারা সকল শ্রমিককে অস্থায়ী কাজ ও দারিদ্র্য উপহার দেবে।
- সর্বনিম্ন মজুরীতে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর নারকীয় কর্মস্থলে প্রতিদিন ১২ঘন্টা কাজ করতে শ্রমিকদের বাধ্য করবে।

- সর্ম্পূণ অনিরাপদ ও নিরাপত্তা বিহীন কর্মক্ষেত্রে শতশত শ্রমিক মারা যাবে এবং মারাত্মক জখম হবে।

- শ্রমিকদের সকল অধিকারকে অস্বীকার করা হবে এবং জোরপূর্বক তাদের ট্রেড ইউনিয়ন না করতে বাধ্য করা হবে।

- সামাজিক নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা থাকবে না।

- বিশ্বের সর্বত্র সব দেশে সকল কোনায় কোনায় ঠিকাদারি পদ্ধতি, অস্থায়ী পদ্ধতি, দিনভিত্তিক মজুরি পদ্ধতিতে কাজের বিস্তৃতি ঘটানো হবে।

- জোরজবরদস্তিমুলক শ্রম,শিশু শ্রমের বিস্তার ঘটানো হবে।

- পরিবেশ ধ্বংস করা হবে।

- কলকারখানায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, সেবা কার্যধারায় সর্বত্র গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে অস্বীকার করা হবে।

- বিশ্বের সব দেশের কোনায় কোনায় আধুনিক দাসপ্রথা চালু করা হবে। এভাবেই শোভন কাজকে পরিত্যাগ করা যাবে।

এভাবেই শোভন কাজকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনের শতকরা ৯৪ ভাগ শ্রমিকই ঠিকাদার, তস্য ঠিকাদার প্রভৃতির আড়ালে গুপ্ত বা লুক্কায়িত থাকে। পৃথিবীর কোন বহুজাতিক কোম্পানিই তাদের সরবরাহ চেইনে নিয়োজিত শ্রমিকদের দায়িত্ব নেয় না। এই সরবরাহ মডেল চেইনে শ্রমিকদের মানুষ হিসাবে গন্য করা হয় না। সুতরাং এই সরবরাহ চেইন মডেল কোনভাবেই গ্রহনযোগ্য হবে না।

২০০৮ সাল থেকে আই,টি,ইউ,সি এবং তার অন্তর্ভুক্ত সংগঠন সমূহ সারা বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ৭ই অক্টোবর শোভন কাজ দিবস পালন করে থাকে।

এই দিনে সারাবিশ্বের মেহনতী মানুষ শোভন কাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমবেত হয়। এইদিনে তারা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় নিরাপদ কর্মস্থলের দাবীতে, বাঁচার মত জীবনযাপন করতে, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথভাবে দরকষাকষির অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে। এই বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো End Corporate Greed-কর্পোরেটদের লোভ খতম কর। এই লক্ষ্যে সারা বিশ্বের শ্রমজীবি মানুষের সাথে বাংলাদেশের সকল মেহনতী মানুষ ৭ই অক্টোবর, ২০১৬ শোভন কাজ দিবস পালন করে যা অর্থনৈতিক রূপান্তরের জন্য গতিশীলতা বৃদ্ধি করবে এবং যা আজকের বিশ্ব খুবই প্রত্যাশা করছে। মানুষকে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু করে একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকল্প আর কিছু নাই এবং এটা করা সম্ভব।

শিল্পের অধিকারকেন্দ্রিক কাঠামোগত পরিবর্তন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধারণা এবং নীতি নির্ধারন প্রসঙ্গে প্রস্তাবনা -বিষয় রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকল

ড. ফাহ্‌রীন আলমগীর [১]

অধিকার কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার রূপরেখা

এই গবেষনার সময়কাল সেপ্টেম্বর ২০১০ থেকে এপ্রিল ২০১১। অর্থাৎ মহাজোট সরকারের পাট-সেক্টর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং গবেষণা কাজটি যুগপৎ চলেছে। গবেষণা কাজটি সংগঠিত হয়েছে খালিশপুর অবস্থিত একটি সরকারি পাটকল, বিজেএমসি, শ্রমিক নেতা, পাট, পাট শিল্প, পাটকল রক্ষা জোট-এর সদস্য এবং পাট রক্ষা কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে। সংগৃহীত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠে মানুষের যোগ্যতা বা ক্ষমতা তার জীবন যাত্রার মানকে নির্ণয় করে। মানুষ মনে করে ন্যায্য পাওনা সব সময় ন্যায়সংগত দাবী।

জীবিকার অধিকার, পাটকল বা চটকল শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি, এবং এই পরিচয় ধরে রাখার বিষয়গুলো অর্থাৎ পেশাভিত্তিক এই পরিচয় যা গত ৫০ বছর ধরে চলে এসেছে সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার বিষয়গুলো টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য এবং সেই সাথে অধিকার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে! মূলত মিল একটি পরিসর। সেই পরিসরে এই শ্রমজীবি মানুষ তাদের জীবিকার জন্য নির্ভর করেনা, বলা যায় মিলের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। মিল-কলকারখানা চালু রাখা হবে এই প্রতিশ্রুতি এবার মহাজোটের সরকার ক্ষমতা গঠনে অন্যতম কারন। সুতরাং আলোচনার পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায় ভোটের অধিকার বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের অধিকারের বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ বুঝা যায়।

বস্তুত চাষজমি থেকে উপেক্ষিত বা নদী-ভাঙ্গনে গৃহহীন ছিন্নমূল মানুষগুলোর রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোকে নির্ভর করে পেশাভিত্তিক পরিচিতি- পাটকল শ্রমিক এবং জীবনাচরন গড়ে উঠেছে। উদারনীতিবাদ এবং বিশ্বায়নের নীতিমালা Jute Adjustment Credit Program অভিঘাতে দেখা দেয় তাদের অস্তিত্বের সংকট। মনে হয় শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দেয়াই হল উদারনৈতিকতাবাদের তত্ত্বের পুঁজিবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যানার্জী (২০০৮) মতে এই পুঁজিবাদ হল Necro Capitalism। এই পুঁজিবাদের ব্যবস্থাপনা উচ্ছেদ, অবদমন এর মাধ্যমে উদ্বৃত সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে টিকে থাকে। উন্নয়নের এই ফলাফল এবং অভিঘাতকে Escober (1995) death world বলে অভিহিত করেছেন।

বাজার-কেন্দ্রিক শিল্প কারখানার Restructuring প্রেক্ষাপটে অধিকার কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার কাঠামোটি নির্মিত। এই পর্যালোচনায় আইনী কাঠামোর বহুমুখীতা এবং

[১] প্রভাষক, স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট, কারটিন বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া

বৈপরীত্যগুলো উঠে এসেছে। **প্রথমতঃ** সংবিধান নাগরিকদের যে সকল অধিকারের কথা বলে থাকে; শ্রম আইনের আওতায় শ্রমিক হিসেবে অধিকারের পরিসর কিন্তু সীমিত হয়ে যায়। **দ্বিতীয়তঃ** আবার আন্তর্জাতিক বা বৈশ্বিক আইনগুলো বাস্তবায়নে কখনোই কোন রাষ্ট্রকে বাধ্য করা সম্ভব নয়। **মূলতঃ** বৈশ্বিক নীতি নির্ধারনী প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকার সুশাসন এবং গণতন্ত্রায়নের আলোচনা কতখানি অন্তঃসারশূণ্য তা ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন এবং সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচীর সমর্থনের মধ্যে প্রতীয়মান হয়েছে।

অধিকার কি এবং তার ধরন: মিল এবং রাষ্ট্র

মিল চালুর সাথে অধিকারের বিষয়গুলো সম্পর্কিত। তাদের মতে অধিকার এবং তার উপাদানগুলো হল

অধিকার	**উপাদান**
অধিকার	কর্মসংস্থানের অধিকার, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং উত্তরাধিকারদের জন্য মিলের নিশ্চিত জীবিকা।
শ্রমিকের ধারনায় অধিকার কি?	মিল চালু, সুনিশ্চিত জীবিকা, সুস্থির কাজের পরিবেশ, যথা সময়ে বিনা ঘুষে পেনশন গ্রহণ, কাজের পরিবেশ, সময়মত মজুরি, বাসস্থানের ব্যবস্থা, মিল, মজুরি, সরকার ঘোষিত কোন সুবিধা যথচিত বন্টন, সন্তানদের মানসম্পন্ন শিক্ষা, ইউনিয়নের অধিকার, ক্যাপাসিটি ডেভেলপ-এর অধিকার (সক্ষমতা অর্জনের অধিকার)। অর্থাৎ শ্রমিক হিসেবে সম্যকভাবে জীবন যাপনের অধিকার।
১৯৯১ থেকে শিল্পের কাঠামোগত পরিবর্তনের কারনে অধিকার হিসেবে এখন যে বিষয়গুলো এসেছে	শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি, সময়মত মজুরী এবং পেনশন, সময়মত মজুরি রিভিসিন, সক্রিয় ইউনিয়ন, এন্টারপ্রাইজ বোর্ড-এ প্রতিনিধিত্ব, মিল সংক্রান্ত তথ্য জানা, শ্রমিক হিসেবে তাদের আইডেন্টিটি, এবং তাদের সন্তানদের মিলে অন্তর্ভুক্তির বিষয় নিশ্চিতকরা।

অধিকার কেন্দ্রিক শিল্প কাঠামো এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এবং উপাদানগুলো ঢাকায় ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত South Asian Social Forum আলোচিত হয়। উক্ত আলোচনায় মডারেটর এ,কে,এম মাসুদ আলী বলেন, রাষ্ট্র

গঠনের দর্শন এর সাথে যখন রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির সমন্বয় থাকেনা, তখনই রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নীতি বিচ্যুতি দেখা দেয়। আর তাই সাংবিধানিকভাবে রাষ্টায়ত্ত্ব মালিকানাকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে শিল্পনীতিমালা, Jute Sector Adjustment Credit Program এবং সাম্প্রতিক পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের আলোচনায় ব্যাক্তিমালিকানা, বা সমন্বিত মালিকানায় পরিচালনার বিষয়টি বার বার স্থান পেয়েছে এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে-সকল ব্যর্থতাসহ। এমনকি চিহ্নিত ব্যর্থতাগুলোকেও সংস্কারের বিষয়টি সেভাবে আলোচনায় আসছেনা। সেই প্রেক্ষাপটে এই অধিকার-কেন্দ্রিক শিক্ষা কাঠামো এবং ব্যবস্থাপনার আলোচনা একটি নতুন দিক নির্দেশনা। সেই আলোচনায় রাষ্ট্রাধীন কলকারখানার সীমানা আটকে থাকেনা, ব্যক্তি মালিকানাধীন কারখানা ব্যবস্থাপনায় এর প্রয়োগ সম্ভব।

অধিকার কেন্দ্রিক শিল্প কাঠামো এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এবং উপাদান

- পুরো সেক্টরটিকে একটি জাতীয় সেক্টর এবং পাট অর্থনীতির দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করা।
- সকল স্তরের পাটের সাথে সম্পর্কিত মানুষদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সামগ্রিক পরিকল্পনা, রূপরেখা প্রণয়ন।
- নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সমন্বয় দরকার এবং কোন রকম বিচ্যুতি চলবেনা।
- পাট নীতি সকল প্রকার রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ নীতি প্রণয়নে সকল প্রকার রাজনৈতিক দল, এবং সম্ভাব্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্ভাব্য উপদেষ্টাদের অভিমত গ্রহণ এবং অংশগ্রহণ থাকতে হবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে রাষ্ট্রীয়ও পাটকল যে এবং পাট-সেক্টর পরিচালনায় যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়েছে অতীতে সেটা চলতে দেয়া যাবে না।
- তথ্য সরবরাহ এবং তথ্য প্রদানের বিষয়গুলো ব্যাপক করা প্রয়োজন।
- জীবিকার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জানবার অধিকার আছে সকলের।
- মিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল তথ্য সরবরাহ করতে হবে।
- BJMC কে সমন্বয়ের বিষয়ে কৌশলী হতে হবে। অর্থাৎ বাজার বুঝে, চাহিদা দেখে, উৎপাদন পরিকল্পনা এবং পাট উৎপাদনের সাথে তার সমন্বয় থাকতে হবে।
- CBA এবং BJMC এর ভেতর আলোচনা দরকার।
- সেলস প্রসিড মিলের একাউন্টে সরাসরি জমা হয়ে যাবে।
- কাঁচাপাট ক্রয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাধ্যতামূলক।

- শ্রমিকদের সাথে BJMC-এর কর্তৃপক্ষের নিয়মিত আলোচনা।
- BJMC-অফিসিয়ালদের নিয়মিত মিল পরিদর্শন।
- CBA সদস্য এবং ব্যবস্থাপনার ভেতরকার আলোচনা আনুষ্ঠানিক হতে হবে এবং আলোচনার বিষয়বস্তু সকলকে জানিয়ে দিতে হবে। একই সাথে আলোচনার বিষয়গুলো প্রকাশ করা জরুরী।

আলোচনার প্রেক্ষাপট এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে কমিউনিটি বিশ্বায়ন বা বাজার সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে নয়। বরং ব্যবস্থাপনা এবং গর্ভানেন্সের বিষয়গুলো দাতাগোষ্ঠীর সুশাসনের বিষয়গুলোর সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ।

শিল্প কারখানার গভর্নেন্স এবং পরিচালনার কাংখিত কাঠামো

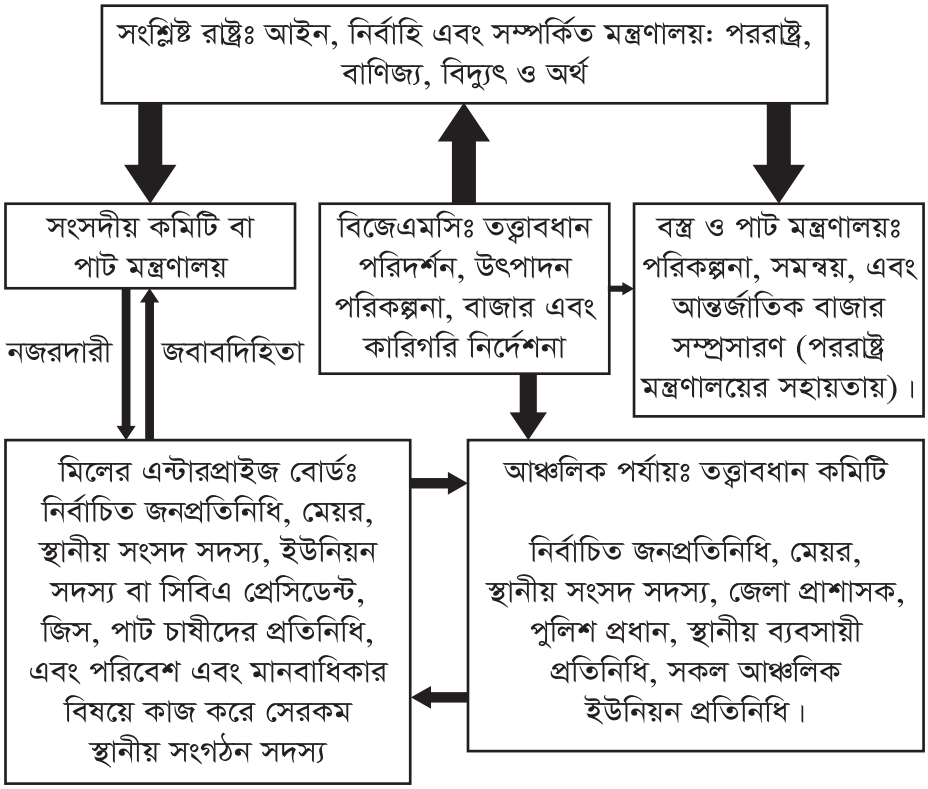

কাংখিত অন্তর্ভূক্ত এবং অংশগ্রহণ

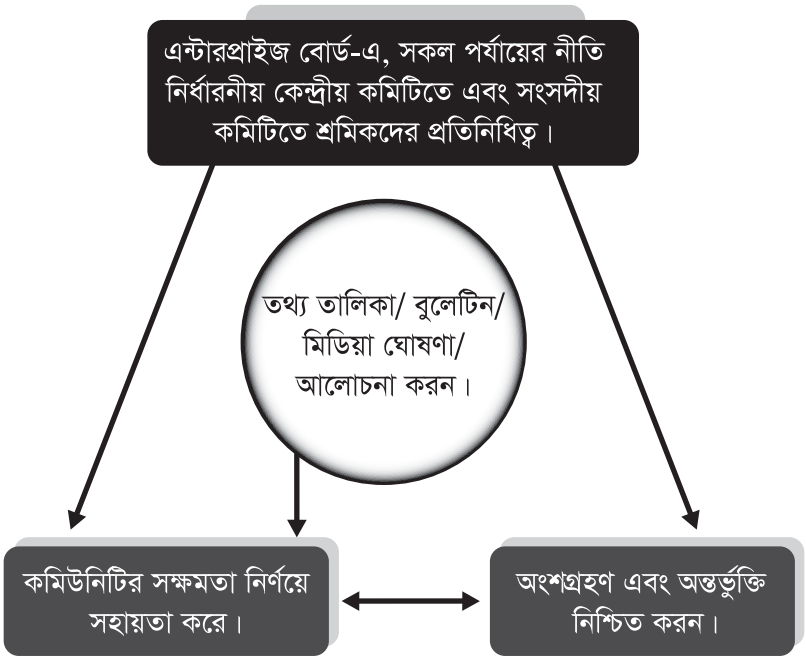

আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি মিলের চলমানতা নির্ভর করে রাজনৈতিক সরকার কাঠামো, সেই সরকারের সদিচ্ছা- অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা যাদের দখলে থাকে তাদের উপর। এবং শ্রমিক/ও পাট কমিউনিটির মতে বলা যায়- সরকার আইন প্রণয়ন এবং পরিচালনা প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয়- প্রতিটি প্রতিষ্ঠান শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় ব্যাপৃত বা বাজার কেন্দ্রিক সম্প্রসারণে।

পাটকল কমিউনিটি মনে করেন রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোকে ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে দেখার সময় এসেছে। কলকারখানা শধুমাত্র বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়; এই কলকারখানাগুলোর উপর দেশের কৃষক এবং শ্রমিক সম্প্রদায় নির্ভর করে। সুতরাং এই খাতকে এবং কারখানাগুলো দেখতে হবে অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোন থেকে। দেশের অর্থাৎ-সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য-বিমোচন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে হিসেবে। শুধু ব্যক্তি মালিকানায় বিরাষ্ট্রীয়করণ কোন সমাধান নয়। বরং এই কর্মকান্ডের ভেতর সকলের স্বার্থ সংরক্ষিত এবং সমন্বিত করা যায় সেরকম কাঠামো নির্ধারণ জরুরী।

অধিকার কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং এর নীতি নির্ধারনী পরিসর, নীতিমালা প্রণয়ন প্রণালী সেই রকম ইঙ্গিত বহন করে। আজকে অধিকার-ভিত্তিক উন্নয়নের যে আলোচনা বিভিন্ন এন,জি,ও এবং ডোনার এজেন্সী-এর মুখে আমরা শুনে থাকি- সেগুলো নাগরিকদের ক্ষমতায়নের কথা বলে তাহলে কিভাবে অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা বলে আমরা আমাদের দেশের সক্ষম নাগরিক যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের

শ্রমিকদের জীবন, জীবিকা, নিরাপত্তা, তাদের অস্তিত্বকে কেন বিপর্যস্ত করে তুলছি। সক্ষম বলতে মনে করা হয় যারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানেন এবং অধিকার আদায়ের কৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত।

এই প্রেক্ষাপটে বতমান পাটনীতি ২০১২ পর্যালোচনা শ্রমিক প্রতিনিধিদের বিষয়টি আমরা দেখি উপেক্ষিত হয়েছে। সেক্টরের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নের জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তাবনা আছে, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীকে সভাপতি করে উক্ত কমিটিতে BJMC–এর Chairman এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকলগুলোর মালিকপক্ষের প্রতিনিধিত্ব এবং কৃষক প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব বিষয়টি আলোচিত হয়নি।

নীতি প্রণয়নকারীদের প্রতি সুপারিশ

অমর্ত্য সেন মনে করেন মানুষের সক্ষমতা নির্ধারন করার উপাদানগুলো মানুষের অধিকার (১৯৯৯, ২০০৪)। সেনের এই বক্তব্যের সাথে আমরা সামাঞ্জস্য খুঁজে পাই অধিকার কেন্দ্রিক শিল্পকাঠামো নির্ধারণ এবং সেই ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার আলোচনায়।

অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি পুরো অধিকারকেন্দ্রিক আলোচনার কেন্দ্র-বিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সেই অর্থে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং তার উপাদানগুলো যেমন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, তথ্যের সরবরাহ এই প্রক্রিয়ার পূর্বশর্ত । কারণ একমাত্র জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে সকলের পক্ষে বিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্তে সম্যক অংশগ্রহণ সম্ভব; এবং জবাবদিহিতার বিষয়টি সুদৃঢ় করে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি প্রত্যেকটি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সব ব্যক্তিদের স্বীকৃতির বিষয়টিকে অর্থাৎ প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় যে একটি প্রতিষ্ঠান বা সিস্টেমের পরিচালনার জন্য অপরিহার্য সেই বিষয়টি মূখ্য হয়ে দেখা দেয়।

বাস্তবিকই যে কোন ধরনের নীতি নির্ধারণী আলোচনায় প্রান্তিক গোষ্ঠীর বাইরে থাকে। ক্ষমতা কাঠামোর কাছাকাছি যারাই থাকে তারাই আলোচনায় অংশ নিতে পারে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোতে একধরনের শিল্প কারখানা সংস্কৃতি আছে। শ্রমিকদের ইউনিয়ন ভিত্তিক রাজনীতি করবার, দেখবার এবং এর সুফল পাবার অভিজ্ঞতা আছে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে। আমি স্থায়ী এবং বদলী শ্রমিকদের কথা মনে করেই বলছি। সকলেই প্রত্যেকটি মিলে যে অংশগ্রহণমূলক কমিটি থাকা উচিত আইনের এই ধারাটির বিষয়ে ওয়াকিবহাল। সুতরাং পরিবেশ এবং সংস্কৃতি অধিকার কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে উপযোগী সমন্বিত পরিকল্পনার সাথে অন্যান্য যে বিষয়গুলো সার্বিক নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার জন্য আলোচিত হয়েছে তা হল:

প্রথমত : মিল চালু থাকতে হবে- অর্থাৎ জীবন এবং জীবিকার অধিকার। যদি তাই হয় তবে সকলে মিল পরিচালনার নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত: সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এবং সেই সাথে তাদের মৌলিক পাওনার বিষয়গুলো। মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলো মানুষর সক্ষমতা নির্ধারণের নির্ণয়ক। সেই বিষয়টি সকলের জন্য স্থায়ী, বদলী, সকল

সকল শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এই পাওনার মান এবং মাত্রা তারা নির্ধারন করে দিয়েছে। শ্রমিকরা মনে করেন রাষ্ট্রায়ত্ত স্কুল এবং হাসপাতালের মত মিলে স্কুল এবং হাসপাতাল পরিচালিত হবে।

তৃতীয়ত: সংবিধানের ঘোষণার সাথে সমন্বিত রেখে রাষ্ট্রায়ত্ত মিলগুলো রাষ্ট্রের অধীনেই থাকবে এবং সেটাই সকলের দাবী। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত মিলগুলোর সাথে যে সকল রাষ্ট্রায়াত্ত সেবাখাতগুলো যুক্ত -অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং বিদ্যুৎ বিভাগের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। শুধু ব্যাংকগুলো সময়মত পাটক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ সরবরাহ করে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়মিত হয় তাহলে উৎপাদন নিশ্চিত। এছাড়া, উৎপাদন পরিকল্পনায় বাজারজাতকরণ এবং কারিগরী উন্নয়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। BJMC-এর তত্ত্বাবধানে সেগুলো মিল পর্যায়ে সমন্বিত করা দরকার।

চতুর্থত: সকল স্তরের আলোচনা, যোগাযোগ এবং সমন্বয় প্রয়োজন। সেজন্য প্রথম শর্ত হল প্রত্যেকটি মিলে পার্টিসিপেশন বা অংশগ্রহণমূলক কমিটি গঠন এবং একে সক্রিয় করা প্রয়োজন।

পঞ্চমত: জাতীয় পর্যায়ে মিল পরিচালনার জন্য গঠিত সকল কমিটিতে সকল সম্প্রদায়ের বিশেষত শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। সকল কমিটিতে শ্রমিক, মালিক এবং সরকার থাকে প্রতিনিধির সংখ্যা সমান থাকতে হবে।

ষষ্ঠত: মিল পরিচালনার বিষয়টিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বা জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে। স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সম্যকভাবে জানেন একটি লোকালয়ে চালু মিলের প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং মিল পরিচালনার জন্য গঠন করা এই সকল স্তরের কমিটিতে জন-প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। BJMC-এর Zone Office-এর কাজ হবে সকল মিলগুলোর পরিচালনা সমন্বয় করা। Zone Level কমিটিতে জনপ্রতিনিধদের সাথে জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ কমিশনার অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। মিল প্রশাসন, রাষ্ট্র প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধি সকলেই সকলের মুখোমুখি হবে। এই প্রক্রিয়ায় নির্বাহী ক্ষমতাধারীদের জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। অন্যদিকে মিলের সাথে সম্পর্কিত সম্প্রদায় মনে করেন জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা আছে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন, নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্বই জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত।

সপ্তম: মিল, মিল পরিচালনা সংক্রান্ত-উৎপাদন, বিক্রয়, এবং পরিচালনা নীতি সংক্রান্ত সকল তথ্য জানাতে হবে এবং এটা অধিকার হিসেবে চিহ্নিত। তবে মজুরী এবং সকল প্রকার ন্যায্য পাওনাদি সংক্রান্ত তথ্য মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারিত করা দরকার। সংসদীয় কমিটি এর আলোচনায় মিডিয়ার উপস্থিতি জরুরী বলে বিবেচিত। যেহেতু সংসদীয় কমিটির উপর মিলের এবং BJMC-এর পরিচালনা এবং জবাবদিহিতার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। তাই এই কমিটির মিটিং-এর বিষয় জনসম্মুখে আসা দরকার।

তথ্য অধিকার এখন আইনত স্বীকৃত অধিকার। আর জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য তথ্য অধিকারকে একটি অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচিত।

অষ্টম: শ্রমিক-বান্ধব সক্রিয় ইউনিয়ন দাবীটি উঠে এসেছে। মিলের ব্যবস্থাপনাকে নজরদারীতে রাখার জন্য সক্রিয় ইউনিয়ন জরুরী। এজন্য মিলের এন্টারপ্রাইজ বোর্ডে ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই প্রয়োজন। এছাড়া বাজেট প্রণয়নে এবং উন্নয়নে ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন।

সাংবিধানিকভাবে নারী-পুরুষ সকলের সমান অধিকার। মহিলা শ্রমিকেরা মনে করেন CBA তাদের প্রতিনিধিত্ব দরকার। এবং যেহেতু নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব এখনও সম্ভবপর হয়ে উঠেনি তাই মনোনয়নের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব দরকার। মহিলা শ্রমিকেরা মনে করেন তাদের কাজের পরিবেশের জন্য এই বিষয়টি সহায়ক, বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

নবম: ইউনিয়ন করার অধিকার মানবাধিকার। কিন্তু বদলী শ্রমিকেরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। এছাড়া বদলী শ্রমিকদের আইনী স্বীকৃতি প্রয়োজন। এজন্য দরকার Employment Contract এবং বদলী শ্রমিকের সংগঠনের আইনগত স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি যদি জটিলতা তৈরি করে, তবে বদলী শ্রমিকের CBA নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার দিতে হবে। মিলে বদলী শ্রমিকের সংখ্যা যদি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, তবে বদলী শ্রমিকদের ভোটাধিকার দিলে তা কোন বিরূপ পরিবেশ তৈরী করবেনা। অন্যদিকে নিয়মিত ভিত্তিতে বদলী শ্রমিককে যদি স্থায়ী শ্রমিক করা হয় তাহলে ইউনিয়নভুক্ত হবার বিষয়টি তেমন বাধা হয়ে উঠেনা। কিন্তু বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির জন্য দেখা গেছে বদলী শ্রমিকেরা অনেকেই ১৬ বছরের বেশী বদলী হিসেবে মিলে কাজ করে যাচ্ছেন।

দশম: মিল হবে অবশ্যই একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। মিলের Sales Proceed নিয়মিত ভিত্তিতে ব্যাংকে জমা দিতে হবে। এবং মিলের বাজেট মিল প্রণয়ন করবে। BJMC এবং মন্ত্রণালয়ে ভুমিকা তত্ত্বাবধান এবং নির্দেশনার মধ্যে সীমিত থাকতে হবে। মিলের এন্টারপ্রাইজ বোর্ড-এ অবশ্যই স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার এবং মেয়র অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। যা এর আগেই একবার আলোচিত হয়েছে।

একাদশ: কারিগরী উন্নয়ন প্রয়োজন। আধুনিকায়ন এবং কারিগরী উন্নয়নের সাথে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি নজর রাখতে হবে। মিলে স্কুলগুলোতে পাট, পাটজাত কারিগরী উন্নয়নের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারিগরী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা না করে দক্ষতার অভাব- এই অজুহাতে শ্রমিক ছাটাই করা যাবে না।

দ্বাদশ: ভারতে পাট মিলের প্রসার প্রমাণ করে পাটের বাজার বরাবরই ছিল। এছাড়াও পাট একটি পরিবেশ বান্ধব তন্তু। এই প্রেক্ষাপটে জুট সেক্টর এ্যাডজাসমেন্ট ক্রেডিট প্রোগ্রাম-নীতি বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ব ব্যাকের নীতিমালা প্রনয়নের ক্ষমতার উপর সন্দিহান করে তুলেছে পাটের সাথে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটিকে।

প্রশ্ন উঠে এসেছে গ্লোবাল পলিসি প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা কোথায় নিহিত? কার কাছে? এই প্রশ্ন প্রমাণ করে বিশ্ব ব্যাংক কে এখন স্থানীয় কমিউনিটির কাছে তাদের প্রণীত নীতিমালার ব্যর্থতার উত্তর দিতে হবে।

সর্বোপরি নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা, প্রণয়ন বিধানমালা, মিলের মালিকানা, ইউনিয়নের সক্রিয়তা, Participation Committee চালু করন এবং সক্রিয়তা, ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব, ইউনিয়নে নারী শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব, সংসদীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে, জনপ্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি এবং সরকারের সকল পর্যায়ে নির্বাহী ক্ষমতা ধারণকারী প্রতিষ্ঠানদেরকে মিল পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত কোনটাই সংবিধান বহির্ভুত বা নীতি কাঠামোর বাইরের বিষয় নয়। কিন্তু এগুলো মানুষ দাবী হিসেবে উত্থাপন করেছেন এবং অধিকারকেন্দ্রিক শিল্প-কাঠামো হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

Reference list:

Ali, M., AKM (2011, November). *A Peoples' Perspective on Rights Centric Industrial Restructuring and Sustainability: A Case Study on the State Owned Jute Mills of Bangladesh.* Conducted at the the Particpatry Learning Workshop in the SASF, University of Dhaka. Dhaka.

Banerjee, B. S (2008). Necrocapitalism. *Organisation Studies,* 29(12), 1541-1563

Sen, K. A. (1999). *Development as Freedom.* Oxford: Oxford University Press.

Sen , A (2004). Elements of a Theory of Human Rights. *Philosophy & Public Affairs*, 32 (4), 315-356.

Escobar, A. (1992). Imagining a Post-Development Era? Critical Thought, Development and Social Movements. [Third World and Post-Colonial Issue], Social Text, 31(32), 20-56

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক ও তাঁদের অবস্থান

এ. বি. এম. সাজ্জাদ হোসেন [১]

বিশ্ব ব্যাংকের কাঠামোগত সমন্বয় নীতি বাস্তবায়নের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মজীবি মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যার চেয়ে অনেক অনেক বেশী।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত কি?

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সর্বজনবিদিত কোন সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়নি। এব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের মতামত রয়েছে।

সাধারণভাবে আমরা জানি, যে সব খাতকে প্রাতিষ্ঠানিক খাত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার বাইরের সব খাতই অপ্রাতিষ্ঠানিক।

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা **(আই. এল. ও)** অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সম্পর্কে সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছে-তাহলো;

১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম-পরিসংখ্যানবিদ সম্মেলন (International Conference of Labour Statisticians- ICLS) অনুসারে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বলতে সেই ধরণের কাজ ও উৎপাদন মূলক কর্মকান্ডকে বুঝায় যা ছোট পরিসরে অথবা অনিবন্ধিত উদ্যাক্তা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই সংজ্ঞাটিকে ২০০৩ সালে ICLS বর্ধিত করে আরো বলা হয়েছে যে, যেখানে মজুরীভূক্ত অপ্রাতিষ্ঠানিক নিয়োগ, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বহির্ভূত কর্মসংস্থান অন্তর্ভুক্ত করা হয় - এই বিস্তৃত ধারনাকেও বলা হয় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ।

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শ্রম নীতিমালা,২০১২ এর ২১ নং অনুচ্ছেদে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে-

দেশের মোট শ্রম শক্তির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। যার মধ্যে রয়েছে- কৃষি, নির্মাণ, গৃহ, পারিবারিক ব্যবসা, চাতাল, ইটভাটা, গ্যারেজ, স্থল ও নৌ বন্দর, পরিবহন খাত, আসবাবপত্র তৈরী, স'মিল, কাঠমিস্ত্রি, ঝালাই, অটোমোবাইল, দোকান, হোটেল-রেস্তেরো, মৎস ও গবাদি খামার, পোল্ট্রি, প্যাকেজিং, কেমিকেল কারখানা, প্লাষ্টিক কারখানা, ঔষধ শিল্প, স্বনিয়োজিত ইত্যাদি ধরণের ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত। এ ব্যাপক শ্রমজীবি মানুষের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকার প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করবেন।

[১] প্রাক্তন বিল্‌স কর্মকর্তা

অন্যদিকে বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ এ কারখানা, প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ, শিল্প, শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং শ্রমিক ইত্যাদির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সম্পর্কে কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। শ্রম আইনে প্রাতিষ্ঠানিক বা কারখানা সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। অর্থাৎ উক্ত সংজ্ঞায় বর্নিত বৈশিষ্টের বাইরের কার্যক্রম সমূহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত।

বাংলাদেশ শ্রম আইনে উল্লেখিত শিল্প, প্রতিষ্ঠান ও কারখানা সম্পর্কে নিম্মাক্ত সংজ্ঞা দেওয়া রয়েছে; যেমন-

বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬

''কারখানা'' অর্থ এমন কোন ঘর-বাড়ী বা আঙ্গিনা যেখানে বৎসরে কোন দিন সাধারণতঃ পাঁচ জন বা ততোধিক শ্রমিক কর্মরত থাকেন এবং উহার যে কোন অংশে কোন উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু থাকে, কিন্তু কোন খনি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

''প্রতিষ্ঠান'' অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা বাড়ী-ঘর বা আঙ্গিনা যেখানে কোন শিল্প পরিচালনার জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা হয়।

''প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ'' অর্থ একই অথবা বিভিন্ন মালিকের অধীন কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এমন একাধিক প্রতিষ্ঠান যেগুলিতে একই প্রকারের বা ধরনের শিল্প পরিচালিত হয়।

"শিল্প" অর্থ যে কোন ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপাদন, বৃত্তি, পেশা, চাকুরী বা নিয়োগ।

"শিল্প-প্রতিষ্ঠান" অর্থ কোন কর্মশালা, উৎপাদন প্রক্রিয়া অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যেখানে কোন বস্তু প্রস্তুত হয়, অভিযোজিত হয়, প্রক্রিয়াজাত করা হয় অথবা উৎপন্ন হয়, অথবা যেখানে ব্যবহার, পরিবহন, বিক্রয়, চালান অথবা হস্তান্তর করার লক্ষ্যে কোন বস্তু বা পদার্থের তৈরী, পরিবর্তন, মেরামত, অলংকরণ, সম্পূর্ণ বা নিখুঁতকরণ অথবা গাঁট বা মোড়কবন্দীকরণ অথবা অন্য কোনভাবে নির্মাণ প্রক্রিয়ায় আরোপ করার কোন কাজ পরিচালিত হয়, অথবা এমন অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যাহা সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যে, শিল্প প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করে, এবং নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ–

(ক) সড়ক পরিবহন, রেল পরিবহন সার্ভিস (খ) নৌ-পরিবহন সার্ভিস (গ) বিমান পরিবহন (ঘ) ডক, জাহাজ ঘাট বা জেটি (ঙ) খনি, পাথর খাদ, গ্যাস ক্ষেত্র বা তৈল ক্ষেত্র (চ) বাগান, (ছ) কারখানা (জ) সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান (ঝ) কোন বাড়ী-ঘর, রাস্তা, সুড়ঙ্গ, নর্দমা, নালা বা সেতু, জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙ্গা, পুনঃ নির্মাণ, মেরামত, পরিবর্তন বা ভাঙ্গিয়া ফেলার অথবা জাহাজে মাল উঠানো-নামানো বা লইয়া যাওয়া সংক্রান্ত কাজ বা ব্যবস্থা করার জন্য স্থাপিত কোন ঠিকাদার বা উপ-ঠিকাদারের প্রতিষ্ঠান (ঞ) জাহাজ নির্মাণ ((ট) জাহাজ পূণ:প্রক্রিয়াজাতকরণ (ঠ) ওয়েল্ডিং (ড) নিরাপত্ত কর্মী সরবরাহ জন্য আউট সোসিং কোম্পানী অথবা কোন ঠিকাদার বা উপ-ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান (ঢ) বন্দর; বলিতে সমুদ্র , নৌ ও স্থল বন্দরকে বুঝাইবে (ণ) মোবাইল অপারেটর কোম্পানী, মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী কোম্পানী ও

ল্যান্ডফোন অপারেটর কোম্পানী (ত) বেসরকারী রেডিও, টিভি চ্যানেল ও কেবল অপারেটর (থ) রিয়েল এস্টেট কোম্পানী, কুরিয়ার সার্ভিস ও বীমা কোম্পানী (দ) সার ও সিমেন্ট প্রস্তুতকারী কোম্পানী (ধ) মুনাফা বা লাভের জন্য পরিচালিত ক্লিনিক বা হাসপাতাল (ন) ধানকল বা চাতাল (প) করাতকল (ফ) মাছ ধরা ট্রলার (ব) মৎস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (ভ) সমুদ্রবাহী জাহাজ।

'"শ্রমিক" অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোন ব্যক্তি, তাহার চাকুরীর শর্তাবলী প্রকাশ্য বা উহ্য যে ভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোন প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোন ঠিকাদার বা যে নামেই অভিহিত হউকনা কেন, এর মাধ্যমে মজুরী বা অর্থের বিনিময়ে কোন দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরী, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানীগিরির কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রধানতঃ প্রশাসনিক, তদারকি কর্মকতা, বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

অন্যদিকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বলতে কি বুঝাবে সেসম্পর্কে নিম্মরুপ দেওয়া হয়েছে-

''অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত'' অর্থ এইরূপ বেসরকারী খাত যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকুরীর শর্ত, ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নহে এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ;

বাংলাদেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের অবস্থান:

সরকার কর্তৃক পরিচালিত ২০১৩ সালের শ্রমশক্তির জরিপ অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের যে চিত্র পাওয়া যায় - তা নিম্মরুপ;

মোট শ্রম শক্তি	**৬০.৭ মিলিয়ন**
অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক	৫০.৮ মিলিয়ন
পুরুষ	৩৫.৬ মিলিয়ন
নারী	১৫.২ মিলিয়ন

এছাড়াও এশিয়ান ডেভেলপম্যান্ট ব্যাংক এর তথ্য অনুসারে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের তথ্যাবলী নিম্মরুপ;

ক্রম	**বিবরণ**	**পুরুষ %**		**পুরুষ %**	
		প্রাতিষ্ঠানিক	অপ্রাতিষ্ঠানিক	প্রাতিষ্ঠানিক	অপ্রাতিষ্ঠানিক
০১	শ্রমিক/কর্মচারী	১১.৫	৪.৬	৬.৭	২.৪
০২	মালিক	০.১	০.৩	০.০	০.১
০৩	কৃষি কাজে স্বনিয়োজিত	০.২	১৯.১	০.১	১১.৭
০৪	কৃষিকাজ বহি:র্ভূত স্বনিয়োজিত শ্রমিক	০.৩	১৭.২	০.১	৭.১
০৫	বিনা মজুরীতে পারিবারিক কাজে নিয়োজিত	০০	৯.১	০০	৬০.০
০৬	ক্যাজুয়েল / অনিয়মিত মজুরীতে শ্রমিক	০.৮	২.৭	০.৬	১.৭
০৭	দিনমজুর (কৃষি কাজ)	০.৬	১৬.৬	০.২	২.৯
০৮	দিনমজুর (অকৃষি)	০.৬	১৩.৫	০.৩	৩.৫
০৯	গৃহকর্মী (ব্যক্তিগত বাসা-বাড়ী)	০.৪	২.৫	০.১	২.৭
	সকল ক্যাটাগরীতে মোট	**১৪.৫**	**৮৫.৫**	**৮.০**	**৯২.০**

সূত্র: বিবিএস (সার্ভে- ২০১৩), এশিয়ান ডেভেলপম্যান্ট ব্যাংক (২০১০)

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অবদান:

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত এই বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করছে; যেমন-

- মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৮৩.৪% ভাগ শ্রমিকের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে;
- প্রাতিষ্ঠানিক খাত থেকে ছাঁটাই হওয়া অনেক শ্রমিকের কর্মসংস্থান হচ্ছে;
- বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছাস, প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের কোন না কোন পেশায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে;
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকগন দেশের জিডিপি অর্জণে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে;
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকগন প্রাথমিকভাবে নিয়োজিত কর্মে দক্ষতা অর্জণ করতে পারছে;
- প্রান্তিক বা তৃণমূল পর্যায়ে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি হচ্ছে এবং দারিদ্র বিমোচনে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের বৈশিষ্ট, সমস্যা ও পরিস্থিতি:

নিম্মে কয়েকটি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের বৈশিষ্ট, কর্মধারা, সমস্যা ও পরিস্থিতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো;

দিনমজুর:

শহরকেন্দ্রিক দিনমজুরেরা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পেশা যেমনঃ নির্মাণ কাজ, রাস্তা ঘাট মেরামত, ইট - পাথর ভাঙ্গা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকলেও গ্রামীন দিমজুরেরা বেশীর ভাগই কৃষিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত থাকে।

- শহরে পুরুষ - মহিলা দিন মজুরের বেতন বেশী হলেও গ্রামে কম;
- শহরে ওভারটাইম কাজ করার সুযোগ পেলেও গ্রামীণ শ্রমিকেরা তা পায় না;
- উভয় শ্রেণীর দিন মজুরেরাই কোন বোনাস/বখশিস পায়না;
- কর্মঘন্টা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধরা হলেও সুনির্দিষ্ট কোন কর্মঘন্টা নেই।
- অনেক সময় সড়ক দূর্ঘটনায় আহত এমনকি নিহত হয়। দূর্ঘটনায় পতিত শ্রমিক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায়না।
- ইট পাথর ভাঁঙ্গার সময় অনেকেরই হাতের আঙ্গুল থেতলে যায়;
- বৃষ্টির সময় খোলা আকাশের নীচে কাজ করতে গিয়ে কেউ কেউ বজ্রপাতের শিকার হয়;

- গর্ত খুড়ে কাজ করার সময় অনেকে মাটি চাপা পড়ে।
- সর্দি কাশি, চর্মরোগ, চোখে সমস্যা,গ্যষ্টিক-আলসার রোগে আক্রান্ত হয়। ঘাড়, কাঁধ, ও বুকের ব্যাথায় ভোগে।
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কোন কর্মসূচী চালু নেই।
- ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার নেই। শ্রম আইন থেকে বঞ্চিত।
- মহিলা শ্রমিকদের নিরাপত্তার অভাব। তাঁদের জন্য মাতৃত্বকালীন কোন সুযোগ-সুবিধা নেই।
- মহিলা শ্রমিকেরা পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় সকল ক্ষেত্রে বেতন বৈষম্যের শিকার হয়। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানীরও শিকার হয়।
- মালিক বা কন্ট্রাক্টর বা দালাল কর্তৃক হয়রানি ও প্রতারিত হয়।
- কাজ আছে, বেতন আছে,-কাজ নেই বেতন নেই-এই নীতির ভিত্তিতে কাজ-কর্ম পরিচালিত হয়।
- শিশুদের সাথে নিয়েই কর্মক্ষেত্রে কাজ করে।
- সরকারের শ্রম পরিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

কৃষি শ্রমিকঃ

কৃষিভিত্তিক কাজে হালচাষ, ফসল লাগানো, পানি সেচ এবং ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের কাজে কৃষি শ্রমিকগন নিয়োজিত থাকে। কৃষিকর্মীরা সাধারণতঃ গ্রামীন ভূস্বামী/গৃহস্থ কর্তৃক দৈনিক/মাসিক/বাৎসরিক চুক্তিতে নিযুক্ত হয়।

- কোন নির্ধারিত নূন্যতম মজুরী নেই;
- নির্দ্দিষ্ট কোন কর্মঘন্টা নেই। সন্ধ্যার পরেও রাত-বিরাতে কাজ করলেও কোন অতিরিক্ত মজুরী পায়না।
- ভারী বোঝা বহন করায় পিছলে পরে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে বা ঘাড় মচকে যায়। বুক ও পাজরের ব্যাথায় ভোগে;
- কাঁচি দিয়ে কাজ করার সময় কাঁচিতে হাতের আঙ্গুল কেটে যায়;
- খালি পায়ে কাজ করার সময় পায়ে ফসলের উচ্ছিষ্ট অংশ, মাছের কাটা, লোহার খন্ড ইত্যাদি ঢুকে যায়।
- অধিকাংশ কৃষি কর্মী বিভিন্ন প্রকার চর্ম রোগে ভোগে; হাত ও পায়ের আঙ্গুলের চিপায় এক ধরণের ঘা সৃষ্টি হয়।
- সময়মত খেতে না পারার কারণে গ্যাষ্ট্রিক আলসারে অধিকাংশ কৃষিকর্মী ভোগে;

- পানি, কাঁদায় কাজ করার কারণে বেশীর ভাগ কৃষিকর্মী কাশি ঠান্ডা এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়।
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কোন কর্মসূচী চালু নেই।
- কৃষি কাজে চাষাবাদ, মাড়াই, ধানবুনা, ধানকাটা, ঘাসকাটা, আগাছা বাছাই, ঔষধ ছিটানো, গোলায় তোলা ইত্যাদি ধরণের কাজ-কর্মের জন্য যুগযোপযোগী উপকরণের অভাব।
- মহিলা শ্রমিকদের নিরাপত্তার অভাব। তাঁদের জন্য মাতৃত্বকালীন কোন সুযোগ-সুবিধা নেই।
- মহিলা শ্রমিকেরা পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় সকল ক্ষেত্রে বেতন বৈষম্যের শিকার হয়। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানীরও শিকার হয়।
- কাজ আছে, মজুরী আছে,-কাজ নেই মজুরী নেই-এই নীতির ভিত্তিতে কাজ-কর্ম পরিচালিত হয়।
- শিশুদের সাথে নিয়েই কর্মক্ষেত্রে কাজ করে।
- ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার নেই। শ্রম আইন থেকে বঞ্চিত।

মৃৎশিল্প শ্রমিক:

মৃৎ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকগন প্রথমে মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করে। পরবর্তীতে এই জিনিস পত্র আগুনে পোড়ানো হয় এবং বিভিন্ন প্রকার রং লাগিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। মাটির জিনিসপত্র বিক্রি করে করে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে এই পেশার শ্রমিক শ্রেণী। এরা মূলতঃ আত্ন নির্ভরশীল স্ব-কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক।

উক্ত শ্রেনীর শ্রমিকগনও নানা ধরণের সমস্যায় ভোগে-যেমনঃ

- মাটি কাটা ও মাটি কর্দমাক্ত করার সময় কখনও কোদালের আঘাতে শ্রমিকের পায়ের আঙ্গুল কেটে যায়;
- খালি পায়ে কাজ করার সময় পায়ে ইট, সুরকী লোহা, আগাছার অংশ বিশেষ ঢুকে যায়;
- চরকা ঘুরানোর সময় হাত ও পায়ে আঘাত লাগে;
- কাদায় পা পিছলে পড়ে হাত, পা, কোমর ভেঙ্গে যায়;
- ব্যস্ত সড়কের পাশে বসে মৃৎশিল্পের বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করার সময় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়;
- মাটির তৈরি জিনিস আগুনে পোড়াতে গিয়ে অগ্নিকান্ড থেকে শ্রমিকের ঘরবাড়ি পুড়ে যায়।

- ঠান্ডা সদি, কাশি, এলার্জি ও গ্যাস্টিক, আলসারে ভোগে এবং বাহুতে, বুকে, কাধে ব্যথা হয়।
- মৃৎ শিল্পের শ্রমিকদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় সুনির্দিষ্ট কোন শ্রম আইনের প্রয়োগ নেই।
- ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার নেই।
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কোন কর্মসূচী চালু নেই।

হকার

হকারগন রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করে থাকে। এরা সাধারণতঃ উচ্চস্বরে হাঁক ডাক দিয়ে নিজেদের দ্রব্য সামগ্রীর প্রতি বাসা- বাড়ীতে অবস্থানরত ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। নিজেদের দ্রব্য বিক্রি করার আয় দিয়ে সংসার চালায়। এরাও আত্মনির্ভরশীল ও স্ব-কর্মে নিয়োজিত। এদের সমস্যাও কম নয়-যেমন;

- ফেরি করে জিনিসপত্র/দ্রবসামগ্রী বিক্রি করার সময় চলন্ত যান বাহনের ধাক্কায় দূর্ঘটনার শিকার হয়;
- ফেরি করে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করতে গিয়ে অনেক সময় উন্মুক্ত ম্যানহোলে পড়ে গিয়ে দূর্ঘটনায় পতিত হয়;
- পায়ে ইট, সুরকী, লোহার রড, কাটা ইত্যাদি ঢুকে যায়;
- ধুলো বালি, যানবাহনের কালো ধোঁয়া নাক-মুখ দিয়ে প্রবেশ করে বলে সর্দি, কাশি ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়;
- মাথায় কিংবা ঘাড়ে বোঝা বহন করে বলে ঘাড়, কাঁধে ও বুকের ব্যাথায় ভোগে;
- বেশির ভাগ শ্রমিক গ্যাষ্ট্রিক, আলসার, পেটের পীড়া ইতাদি রোগে ভোগে;
- বেশির ভাগ শ্রমিক অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে।
- হকার/ফেরীওয়ালাদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার থাকলেও তা সীমাবদ্ধ, দূর্বল ও অপ্রতুল।
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কোন কর্মসূচী চালু নেই।

গৃহ শ্রমিক

- কোন নূন্যতম মজুরী নির্ধারণ নেই। মজুরীর কোন সুনির্দ্দিষ্টতা নেই।
- খুব সকাল থেকে কাজ শুরু হয়। প্রায় ১৫-১৬ ঘন্টা কাজ করে।
- নির্ধারিত কোন ছুটি এবং বিশ্রাম নেই।

- অনেক সময় ঝুকিপূর্ণ কাজ করে।
- শিক্ষার ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ নেই।
- গৃহ কর্তা/কর্ত্রীর গালিগালাজ, বকা-ঝকা লেগেই থাকে।
- শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়।
- কর্মচ্যুতি করার হুমকি থাকে।
- সামর্থের অতিরিক্ত কাজ করানো হয়।
- যৌন নিপীড়নের শিকার হয়।
- নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।
- মানষিক হতাশা বিরাজ করে।
- রাতে ঘুমানোর ভালো ব্যবস্থা নেই।
- ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার নেই। শ্রম আইন থেকে বঞ্চিত।
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কোন কর্মসূচী চালু নেই।

উপরোক্ত ধরণের শ্রমিক ছাড়াও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বহু ধরণের শ্রমিক রয়েছে - যাদের সমস্যাবলী প্রায় একই ধরণের। উল্লেখ্য যে নির্মাণ, চাতালসহ অন্যান্য অনেক সেক্টর রয়েছে - যাদেরকে প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের সংজ্ঞায় আনা হয়েছে। কিন্তু এসকল সেক্টরকে আধা - প্রাতিষ্ঠানিক আবার অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যেভাবেই বলা হউক না কেন, সরকার কর্তৃক স্বীকৃত উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানপুঞ্জেও শ্রম আইনের প্রয়োগ সীমিত, দূর্বল। কোথাও প্রয়োগ নেই বললেই চলে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সমস্যার মূল কারণসমূহ:

(১) সস্তা ও সহজলভ্য শ্রমবাজার;

(২) আইনগত শিথীলতা, সীমাবদ্ধতা এবং কার্যকর আইনের অভাব;

(৩) শ্রমিক সংগঠন/ট্রেড ইউনিয়নের অভাব;

(৪) মালিক পক্ষের সদিচ্ছা/ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গির অভাব;

(৫) মালিক/ঠিকাদার/উপ-ঠিকাদার পক্ষের অধিক মুনাফা অর্জনের মনোবৃত্তি;

(৬) শ্রমিক আধিক্য থাকায় উপযুক্ত মজুরী না পাওয়া;

(৭) সুনির্দিষ্ট কোন আইনের প্রয়োগ না থাকায় মালিককে মজুরী / ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে বাধ্য করা যায় না;

(৮) শ্রমিকেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করে বলে সংগঠিত হতে পারেনা। কর্মসংস্থানের জন্য কাজের স্থান / এলাকা পরিবর্তন করে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন/ কার্যক্রমঃ

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের আধিক্য থাকলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কার্যক্রম খুবই সীমিত। বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ এ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের সজ্ঞা অনুযায়ী অনেক সেক্টরেই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে উঠেছে বলে বাংলাদেশ সরকারের শ্রম পরিদপ্তর সূত্রে জানা যায়। যেমন- নির্মাণ, রাইসমিল (চাতাল), সমিল, হোটেল-রেস্তোরা, দোকান-কর্মচারী, টেইলারিং-দর্জি, কুলি, রিক্স-ঠেলাগাড়ী, ইট প্রস্তুতকারী, আসবাবপত্র, সেলুন, বিউটি পার্লার, পোল্ট্রি ফার্ম, নার্সারী, স্বর্ণ শিল্প, আসবাব পত্র প্রস্তুতকারী, হকার, জেলে, ডেইরী ফার্ম, বই বাঁধানো, ফটোগ্রাফি, হস্তচালিত তাঁত ইত্যাদি সেক্টরসমূহে।

কিন্তু উপরোক্ত সেক্টরসমূহে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলা হলেও সেসকল সেক্টরে সংগঠনের কার্যক্রম খুবই দূর্বল। আন্দোলন-সংগ্রাম কিংবা তাঁদের ন্যায় সংগত মজুরী, সামাজিক নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্মস্থল সংক্রান্ত স্বার্থ ও অধিকার আদায়ে যৌথ দরকষাকষির সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।

ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের মূল মূল সমস্যা ঃ

- অধিকার রক্ষার জন্য তাদের ইউনিয়ন নেই। প্রচলিত আইনে তাদের ইউনিয়ন করার সুযোগ নাই বা সীমাব্ধতা ও জটিলতা রয়েছে।
- তাদের কোন স্থায়ী নিয়োগ কর্তা এবং পেশা / ক্ষতাভিত্তিক কোন পরিচয় পত্র নেই। আজ এক মালিকের কাজ করে তো কাল অন্য জায়গায় আর এক মালিকের কাজ করে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান পরিবর্তন করে।
- বিভিন্ন সময় যেমন মালিক কর্তৃক নির্যাতিত হয় তেমনি তাদের কাজের ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন রকম পেশাগত রোগ ও মারাত্মক দূর্ঘটনায় পতিত হয়। এর কোন সুষ্ঠু প্রতিকারের ব্যবস্থা নাই।
- নির্মাণ শ্রমিক দূর্ঘটনার স্বীকার হলে মালিক তাকে শ্রমিক বলে স্বীকার করে না। প্রকৃত মালিক কর্তৃক নিয়োজিত ঠিকাদার / উপ-ঠিকাদার / লেবার সরদার তো তাদেরকে না চেনার ভান করে। ফলে এই বিষয়ে শ্রম আদালতে মামলা হলে মামলার আসামী পক্ষ সহজেই খালাশ পেয়ে যায়।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বেশীর ভাগ শ্রমিক অর্থনৈতিকভাবে খুবই অস্বচ্ছল। নিজেরা যেমন লেখাপড়া জানে না তেমনিই তাদের সন্তানরাও পড়ালেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলে এরা অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে খুবই অসচেতন। পরিবারের সদস্য সংখ্যাও অধিকতর। ফলে মালিক কর্তৃক নির্যাতন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ, পেশাগত রোগ ও দূর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়েও প্রতিনিয়ত তাদেরকে পরিশ্রম করতে হচ্ছে।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের আর একটি বড় সমস্যা হচ্ছে, এখানে নারী-পুরুষের মজুরী বৈষম্য রয়েছে। এছাড়াও কিন্তু তারা পাচ্ছেনা ন্যায্য

মজুরী। নারী শ্রমিকগন যৌন হয়রানীর শিকার হয়। শিশু শ্রমের বিরাট অংশ এই খাতে বিদ্যমান। তাদেরকে হতে হচ্ছে বিভিন্ন রকম হয়রানীর স্বীকার। যাপন করছে মানবেতন জীবন।

- সেক্টর ভিত্তিক ন্যূনতম মজুরী ঘোষিত হলেও বাংলাদেশে কোন নূন্যতম জাতীয় মজুরী ঘোষণা করা হয়নি।

শ্রম আইনের প্রয়োগ, সীমাবদ্ধতা ও দূর্বলতা:

প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের তালিকায় দেখা যায় যে, সেখানে অনেক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সীমাব্ধতা ও দূর্বলতা রয়েছে -যেমন;

- কোন ইউনিয়ন গঠন করতে হলে সীমাবদ্ধ এলাকায় অর্থাৎ জেলা / উপজেলা/সিটি কর্পোরেশনের আওতায় কর্মরত অবস্থায় মোট কতজন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে-সেসম্পর্কে সরকারের যেকোন সংস্থার নিকট সঠিক পরিসংখ্যান ও তথ্যাবলী থাকতে হবে। এব্যাপারে সঠিক পরিসংখ্যান ও তথ্যাবলী নির্ধারিক এলাকায় নেই। যদি না থাকে তাহলে ইউনিয়ন গঠনের জন্য মোট শ্রমিকের ৩০% শ্রমিক সদস্য হয়েছে -তা প্রমান করা অবাস্তব। অন্যদিকে শ্রমিকদের কোন নিয়োগপত্র বা পেশার/দক্ষতার কোন পরিচয়পত্র নেই।

- কোন কোন পেশার অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকগণ সাধারনত: কর্মসংস্থান কিংবা পরিবারের আয়-রোজগার বৃদ্ধি করতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কাজ করতে চলে যায়। সেক্ষেত্রে যেমনি করে মালিক ও এলাকা পরিবর্তণ হয়-তেমনি ইউনিয়ন গঠন হলেও সদস্য সংখ্যা কমে যায়। কিংবা ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাঠামো দূর্বল হয়ে পড়ে।

- কর্ম বা পেশার চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও মালিক পরিবর্তন হওয়ার কারণে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের আওতাধীনে ইউনিয়ন গঠিত হলেও, দাবীনামা সুনির্দ্দিষ্টভাবে কার কাছে জমা দিবে, দরকষাকষি কার সঙ্গে করবে, মীমাংসা কে করবে এবং প্রক্রিয়া কি হবে, মধ্যস্থতা বা সালিশকারক কে হবে, মীমাংসা হলেও তা ঐ এলাকার সকল মালিক মেনে নিতে বাধ্য কি না- তাও শ্রম আইনে স্পষ্ট নয়। এব্যাপারে সীমাবদ্ধতা ও জটিলতা রয়েছে।

- সরকারের কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শণ বিভাগের পরিদর্শকদের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত কিংবা তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে পরিদর্শণের অনুপস্থিতি বা সীমাবদ্ধতা বা স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে করণীয়:

(১) জাতীয় ন্যুনতম মজুরী ঘোষণা ও তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা;

(২) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সমস্যাসমূহ বিবেচনা করে বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ সংশোধন করা কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক / অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সার্কভূক্ত অন্যান্য দেশের মতো পৃথক শ্রম আইন প্রবর্তণ করা;

(৩) কর্মঘন্টা স্থির করা, নিয়োগ পত্র/পরিচয়পত্র/দক্ষতার পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(৪) কর্মঘন্টার বাইরের কাজকে ওভারটাইম কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা;

(৫) চাকুরীর নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা;

(৬) চাকুরী স্থায়ী করা সম্ভব না হলেও চাকুরীর মোটামুটি একটা নিশ্চয়তা থাকবে যা কর্মচ্যুতির ক্ষেত্রে মালিকের স্বেচ্ছাচারীতা রোধ করা;

(৭) কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৮) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য সরকারী পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ও সুবিধাসমূহ চালু করা; যেমন-বীমা, গ্রুপ ইন্সুরেন্স, দূর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, আবাসন সুবিধা, শিশু শিক্ষা, রেশনিং প্রথা চালু, বার্ধক্য ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা;

(৯) শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরী পাওয়ার ব্যবস্থা থাকা;

(১০) বঞ্চিত, শোষিত ও নির্যাতিত শ্রমিকরা যাতে আইনগত সুবিধা পায় সেটা নিশ্চিত করা;

(১১) দূর্ঘটনা কবলিত শ্রমিকের উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা;

(১২) আইএলও কনভেনশন ১৮৯ অনুসমর্থন ও তদানুযায়ী আইন প্রণয়ণ করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করা;

(১৩) মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মাতৃকালীন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা;

কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (সি এস আর): সামাজিক ন্যায় বিচার ও শ্রমিকের কল্যাণ

খায়রুজ্জামান তপু [১]

বর্তমানে সি এস আর আমাদের কাছে নতুন একটি আলোচনার বিষয়। তিনটি ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে সিএসআর বিষয়টির উৎপত্তি; মানুষ, পৃথিবী এবং মুনাফা (People, Planet & Profit)।

সিএসআর হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার হবে এবং অগ্রগতিতে অবদান রাখবে। সিএসআর একটি ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা ধারণা যেখানে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশগত ইস্যুকে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করবে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদেরকে এ প্রক্রিয়ায় অর্ন্তভুক্ত করবে। এটি একটি স্বেচ্ছামূলক কাজ, তবে জনসেবা বা দাতব্য কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে না। মূলত জনসেবামূলক বা দাতব্য সংস্থায় আর্থিক অনুদান, ধর্মীয় অনুদান, শীতবস্ত্র বিতরণ, রাস্তা-ঘাট ও স্কুল-কলেজ নির্মান, বৃত্তি প্রদান, রাস্তাঘাটের সৌন্দর্যবর্ধন ইত্যাদি কার্যক্রম সিএসআর হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে যা মূলত: সিএসআর এ অন্তর্ভুক্ত নয়। বেশিরভাগ সংজ্ঞাতেই সিএসআরকে বিবেচনা করা হয় অংশীদারদের কাছে করা প্রতিষ্ঠানের একটি অঙ্গীকার হিসেবে। যেখানে প্রতিষ্ঠান তার অংশীদারদের কাছে অঙ্গীকার করে যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করা হবে। সিএসআর এর পেছনে মূল ধারনা হচ্ছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লাভের জন্য নয়, ব্যবসা হবে সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের জন্যও।

সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে আধুনিক ব্যবসায়ে সিএসআর এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সিএসআর এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তার মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সিএসআর স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনার অঙ্গীকারের অংশ। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মুনাফা নয়, বরং সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন-এটি সিএসআর এর ধারণা। সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়, সরকার এবং সমাজের মধ্যবর্তী ভূমিকা এবং পারস্পরিক সম্পর্কও পূনর্বিন্যাস্ত করে।

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেহেতু সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য প্রধান উন্নয়ন অংশীদার সেহেতু সামাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আন্তর্জাতিক নীতি ও নিয়ম অনুযায়ী নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রেসার গ্রুপ ও সহযোগী হিসেবে কাজ শুরু করা। ইউরোপীয় কমিশন সিএসআর-কে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে, 'একটি ধারণা যার দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা এবং অংশীদারদের সাথে মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে স্বতঃর্ফূতভাবে সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়াবলী সম্পর্কে খেয়াল রাখে'। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিএসআর আধুনিক ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে, শুধু বাংলাদেশেই নয় সমগ্র বিশ্বে। একটি সামাজিক

[১] মিডিয়াকর্মী

দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হলো সেটাই যার ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ বহুবিধ অংশীদারদের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখে। একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান শুধু নিজেদের অংশীদারদের লাভের জন্য কাজ করে না, সে তার কর্মচারী, সরবরহকারী, বিক্রেতা, স্থানীয় জনগন ও সর্বপরি দেশ জাতির উন্নয়নের জন্য কাজ করে।

বাংলাদেশে বর্তমানে কিছু প্রতিষ্ঠান সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে ব্যাংক, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী, বহুজাতিক পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্যভাবে বলা যেতে পারে রহিম আফরোজ গ্রুপ গ্রামাঞ্চলের সৌর শক্তি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ ও স্বল্পমূল্যে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সরবরাহ করছে, স্কয়ার গ্রুপ বাসক নামক ভেষজ ঔষধ উৎপাদনে কৃষকদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষন ও বীজ বিতরণ করে আর্থিক স্বচ্ছলতায় অবদান রাখছে, নাভানা গ্রুপ গুলশান অঞ্চলে রোড ম্যাপিং করেছে ঐ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে, মোহম্মদীয়া গ্রুপ স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিনামূল্যে শিক্ষা ও শিক্ষাসামগ্রী প্রদান করছে শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের, সপুরা স্কিল মিলস গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করেছে, ইস্পাহানি গ্রুপ চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে, জনতা ব্যাংক মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনমান উন্নয়নে সেবা এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা দিচ্ছে। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জনগনের জন্য নিরাপদ পানি, শিক্ষাবৃত্তি, কম্পিউটার প্রদান, বনায়ন ইত্যাদি কাজ করছে। রাজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী সিএসআর কার্যক্রমের মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠান ১০% ট্যাক্সছাড় পায়।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে (ওয়েন ২০০৭) সামাজিক দায়বদ্ধতা বাস্তাবায়ন করতে বিশ্ব ব্যাংক, অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই সংস্থাসমূহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখছে যেমন পরিবেশ সম্পকিত বিষয়, যেখানে অন্যরা তাদের মনোযোগ দিচ্ছে শ্রম ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে (ক্যারল ১৯৯৯) বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান সিএসআর গ্রহন করার মাধ্যমে পরিচিত বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তাই দিন দিন সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সিএসআর উদ্যোগ হিসেবে পরিচিত জাতিসংঘের গ্লোবাল কম্প্যাক্ট (ইউএনজিসি ২০১৩) এ ১২০০০ এর উপর ব্যবসায়িক ও অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং ১৪৫ টি দেশ যোগদান করেছে। সিএসআর শুধুমাত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা গবেষকদের কাছেই গুরুত্ব পাচ্ছে না, এটা সরকারেরও মনোযোগ আকর্ষণ করছে। সাম্প্রতিক বিষয়াবলী ভিত্তিতে স্টুরার (২০১০) পাঁচটি ইস্যু খুজে পেয়েছে যার কারণে সরকার সিএসআর বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে। প্রথমত ব্যবসায়িক উদ্যোগ সরকারের টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ নীতির উদ্দেশ্যপূরণে সাহায্য করবে। এছাড়া পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য, যেমন মানব সম্পদ উন্নয়ন ও স্বেচ্ছাসেবী ভিত্তিতে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সরকারের সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, সিএসআর নীতিমালাসমূহকে কঠোর আইনি বিধানের সম্পূরক হিসেবে ধরা হয় যেখানে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন বিধানসমূহ রাজনৈতিকভাবে কাঙ্খিত হয় না।

তৃতীয়তঃ সরকার চায় এবং চেষ্টা করে যাতে এই ধরনের উদ্যোগ আপোষের মাধ্যমে ও স্বেচ্ছায় গৃহীত হয়, যাতে আইনি বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন না পড়ে। যেমন টেকসই উন্নয়নের স্বেচ্ছায় ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহন। চতুর্থত সিএসআর এর নমনীয় নীতি জনপ্রশাসনে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটায় যা চিরায়ত নিয়ম থেকে সরে গিয়ে আরো বিস্তৃতি লাভ করে এবং অংশীদারিত্ব প্রক্রিয়াকে নিজস্ব অথবা সহ ব্যবস্থাপনায় পরিনত করে। সিএসআর কেবল নতুন বৈশ্বিক কর্পোরেশনের উপাদান নয় বরং এটি নতুন ক্রমবর্ধমান সামাজিক শাসনের একটি বৈশিষ্ট্য। পঞ্চম ও শেষমত, সিএসআর এর ধারণা শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকেই পূর্ণবিন্যাস করে না, এটা ব্যবসা, সরকার এবং সমাজের মধ্যবর্তী ভূমিকা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক পূর্ণবিন্যাস্ত করে।

সিএসআর এর আন্তর্জাতিক মানদন্ড ঃ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সিএসআর নীতিমালা করেছে। ইউএন গ্লোবাল কম্প্যাক্ট/ইউএন গাইডিং প্রিন্সিপালস অন বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস UNGC (United Nations Global Compact) ওইসিডি (অরগানাইজেসন ফর ইকোনোমিক কো-অপারেশন এবং ডেভলপমেন্ট) OECD (Organisation for Economic Cooperation & Development), আইএলও ILO (The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at work) আইএসও ২৬০০০ গাইডেন্স অন সোস্যাল রিস্পনসবিলটি ISO 26000 (International Organisation for Standardisation 26000) এর মতো কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সিএসআর এর যর্থার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নিরলসভাবে বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতিমালা প্রণয়নের কাজ করে যাচ্ছে। ইউএন গ্লোবাল কম্প্যাক্ট অনুযায়ী শ্রম বিষয়ক মূলনীতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সংগঠন ও যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার এবং স্বাধীনতা থাকতে হবে। সকল ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম বর্জন, শিশু শ্রম কার্যকর বিলুপ্তি ও কর্মসংস্থান ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ। ওইসিডি নির্দেশিকা: অনুযায়ী শ্রম সম্পর্কিত বিষয়বস্ত চাকুরি এবং শিল্প সম্পর্ক সংগঠন/ট্রেড ইউনিয়ন করা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার, শিশু শ্রম নিরসন, বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ, বৈষম্যহীনতা, চাকুরি পদোন্নতি এবং নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিবেশ স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫২টি প্রতিষ্ঠান ইউএন গ্লোবাল কম্প্যাক্টে স্বাক্ষর করেছে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেহেতু সমাজের একটি অবিচ্ছেদ প্রধান উন্নয়ন অংশীদার সেহেতু সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আন্তর্জাতিক নীতি ও নিয়ম অনুযায়ী নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রেসার গ্রুপ ও সহযোগী হিসেবে কাজ গুরু করা বাঞ্ছনীয়। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে এর গাইড লাইন্স অনুসরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী পন্য ব্যবসার অবাধ প্রসার ও প্রচলন নিশ্চিত করতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহ অন্যান্য জোটের নির্ধারিত সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতিমালা অনুযায়ী সিএরআর কার্যক্রমের প্রচলন করা উচিত। শ্রমিক কর্মচারী যারা শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অংশীদার তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিএসআর কার্যক্রমের উপকারভোগী হিসেবে অন্তরর্ভুক্ত করার জন্য এ্যাডভোকেসি করা এবং ডিশিসনমেকিং এ শ্রমিকদের অংশগ্রহন বাঞ্ছনীয়। ট্রেড ইউনিয়নকে সিএসআর বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করতে হবে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের সাথে সফল আলোচনা বা দরকষাকষির জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

ইউএন গাইডিং প্রিন্সিপালস অন বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস এর ১০টি মূলনীতি হল সিএসআর এর মূলনীতি। জাতীয় বিধিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিএসআর এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশ সংবিধান অনুচ্ছেদ-১৫ পার্সস্পেকটিভ প্ল্যান অব বাংলাদেশ ২০১০-২০২১ (Perspective Plant of Bangladesh 2010-2021) / ভিশন-২০২১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকপ্পনা, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর নীতিমালা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্র-এসডিজি লক্ষমাত্রা-১: এ বলা হয়েছে সব জায়গায় সব রকমের দারিদ্র্য দুর করণ এবং লক্ষমাত্রা ৮: এ বলা হয়েছে টেকসই অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং সহনশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং সবার জন্য শোভন কাজ নিশ্চিত করার উপর জোর আরোপ করা।

আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের দাবী সিএসআর কার্যক্রমকে জাতীয় শ্রমমান এবং জাতীয় শ্রম আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন এবং একে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম থেকে আইনের আওতায় আনতে হবে। সব কোম্পানিকেই সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের উপর নেতিবাচক প্রভাব ব্যাতিরেকে সিএসআর কে ব্যবহার করতে হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শিশুদের জাতীয় ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করেছে (২০১৫)। সরকার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রে ১০% কর রেয়াত প্রদান করেছে। (সিএসআর নং ১৮৬ আইন/আয়কর/২০১৪)।

অধিকাংশ উন্নত দেশসমূহে (যেমন কানাডা, আমেরিকা, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড) সিএসআর নীতিমালা রয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকায় সিএসআর বিষয়ক নীতিমালা রয়েছে। ভারতে সিএসআর বিষয়ক আইন রয়েছে। সেখানে সকল প্রতিষ্ঠান তাদের লাভ্যাংশের ২% সিএসআর খাতে প্রদান করে।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসআর কার্যক্রম ও কার্যবিধির প্রকৃতি এখন পর্যন্ত মূলত অস্পষ্ট। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে সিএসআর সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা প্রণীত হয় নাই। শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক গুলোতে বাস্তবায়নের জন্য একটি নীতি মালা প্রণয়ন করেছে।

সিএসআর কার্যক্রম সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন তথা শ্রমিক কর্মচারীদের অবহিতকরণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিলস উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সিএসআর কার্যক্রমকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী কার্যকর করা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার এবং শ্রমিকদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সিএসআর কার্যক্রম যাতে অধিকতর অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যে মানদন্ড তৈরি করার জন্য বিভিন্ন দেশের সিএসআর আইন ও নীতিমালা, পাশ্ববর্তী দেশের সিএসআর আইনের উদাহরণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিলপত্রের আলোকে বিল্স একটি জাতীয় নীতিমালা প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহন করেছে।

বিল্‌স "বাংলাদেশের সিএসআর কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা এবং শ্রমিকের অংশগ্রহণের সুযোগ" বিষয়ক একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। বিল্‌স সিএসআর ইউনিট গঠন করেছে। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা, আলোচনা সভা, কর্মশালা সিএসআর বিষয়ক জাতীয় নীতিমালায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সুপারিশ প্রণয়ন ও ভবিষ্যত এডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিভিন্ন কর্মশালায় প্রাপ্ত প্রাথমিক সুপারিশ সিএসআর এর সংজ্ঞা সুস্পষ্ট করা, গাইডলাইন তৈরী করা ও আইনে রূপ দান করা, সিএসআর আইন তৈরিতে ট্রেড ইউনিয়নকে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সহযোগিতা করা, বিভিন্ন দেশে সিএসআর আইন অনুসরণ করে ফান্ড গঠনের উদ্যোগ এর অন্তর্ভক্ত।

বাংলাদেশ সরকার সিএসআর বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রণালয় থেকে সব সেক্টরের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে মতামত আহবান করা হয়েছে। বিল্‌স নিয়মিত গোলটেবিল বৈঠক আলোচনা সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করে। বিল্‌স সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। চলতি বছরে ৮ই আগস্ট প্রতিষ্ঠানটির সেমিনার হলে এজাতীয় একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নুভিস্তা ফার্মা, এসিআই, সেভরণ, চা-বাগান, বিটিসিএল, জাতীয় শ্রমিক ফ্রেডারেশন, জীবনবীমা, জনতা ব্যাংক, সানোফি, বৃট্রিশ আমেরিকান টোব্যাকো, সোনালী ব্যাংক ও মুক্ত শ্রমিক ফ্রেডারেশন এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহন করেন। সভায় জানা যায় সিএসআর কার্যক্রম কোন কোন প্রতিষ্ঠানের চলমান রয়েছে। আবার কোন প্রতিষ্ঠানে লোক দেখানো সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর সাথে শ্রমিক ইউনিয়নের কোন সম্পৃক্ততা নাই। কোন কোন প্রতিনিধি মতামত দেন যে তারা এই সভায় এসে প্রথম বারের মত সিএসআর এর কথা প্রথম শুনলেন। বিল্‌সএর লক্ষ্য হচ্ছে সরকারের সিএসআর নীতিমালায় শ্রমিক প্রতিনিধিদের মতামতের প্রতিফলন ঘটানো।

বিল্‌স

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনকে সুসংহত, স্বনির্ভর ও ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ 'বিল্‌স' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স-এর লক্ষ ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- সকল শ্রমজীবী মানুষকে তাদের মৌলিক ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করা;
- বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা;
- নারী-পুরুষসহ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র ও ট্রেড ইউনিয়নে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা;
- সংগঠন পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা;
- শ্রমিক অধিকার স্বার্থে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা;
- শ্রমিক আন্দোলনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা;
- বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহকে অবহিত করার লক্ষে তথ্য সরবরাহ, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষে বহুমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করা;
- শ্রমিক কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো;
- উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষে কর্মসূচি গ্রহণ করা।

প্রকাশনা সহযোগিতায় : FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Bangladesh Office